প্রকাশক
শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য
অন্নদা বুকষ্টল।
৭৮।২নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
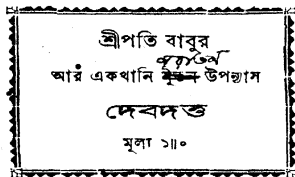
মানসী প্রেস
১৪।এ রামতনু বসুর লেন,
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপায় আট আনা সংস্করণের প্রথমগ্রন্থ "শুভদৃষ্টি" প্রকাশিত হইল; সুলভে সৎ-সাহিত্যের প্রচারোদ্দেশ্যে অতি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এই বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, ভরসা পাঠক-বর্গের সহানুভূতি—সাহিত্য-সুহৃদের কৃপাদৃষ্টি—আর সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীনারায়ণের শ্রীচরণ।

২৫শে মাঘ
১৩২২ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপায় অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদের আট আনা সংস্করণের ১ম গ্রন্থ "শুভ দৃষ্টি"র ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকখানি প্রথম সংস্করণের পুস্তক অপেক্ষা দেখিতে কিছু ছোট হইলেও আসলে কিন্তু একটী অক্ষরও বাদ দেওয়া হয় নাই। ১ম সংস্করণে প্রতি পৃষ্ঠায় ২০টি লাইন ছিল, এবার প্রতি পৃষ্ঠায় ২২টি লাইন আছে। এবং প্রতি লাইনও প্রায় আধ ইঞ্চি বড় হইয়াছে। এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে পূর্ব্ব-সংস্করণের ন্যায় ছাপিতে হইলে প্রতি পুস্তকে প্রায় ॥৵০ আনা খরচ পড়ে; লাভ কিছু না হউক ক্ষতি করা ত সম্ভব নয়। এখন পাঠকবর্গের নিকট পূর্ব্বসংস্করণের ন্যায় এই পুস্তকের আদর হইলে কৃতার্থ হইব। ইতি—প্রকাশক

১০ই পৌষ
১৩২৫

শুভদৃষ্টি

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অল্প বয়সে ম্যালথসের থিয়রীটা মাথায় ঢুকিয়া প্রভাতকে বাতিকগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার উপর সম্প্রতি সে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েক খণ্ড গ্রন্থ ও জীবনীও পড়িয়াছিল। এই সব নানা কারণে বাঙ্গালাদেশের বর-কন্যার বাজারে যখন তার খুব চড়া দামে বিক্রীত হইবার কথা, তখন সে এমন বাঁকিয়া বসিল যে, কেহই তাহাকে বিবাহে লওয়াইতে পারিল না। তাহার যে এক উত্তর ছিল, সেই উত্তরের বলে সে সকলকেই হঠাইয়া দিত। বলিত,—বিবাহ না করিয়াও যখন ঠিক মানুষটি থাকা যায়, তখন বিবাহ করিয়া কয়েকটা অযোগ্য মানুষের পিতা হওয়া অপেক্ষা, নিজেকেই সংসার-সুখে বঞ্চিত রাখা ভাল।

এই লেক্‌চারে দাদা রজনীকান্ত অনেক আগেই হঠিয়া গিয়াছিল, শুদ্ধ এক বিধবা পুত্রহীনা পিসিমাতাই, এই মাতৃহীন উচ্ছৃঙ্খল যুবকের পশ্চাতে একক দাঁড়াইয়া রহিলেন, তিনিই তাহার সমস্ত খেয়ালকে আপনার সুগভীর স্নেহের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া সন্তানের প্রবর্দ্ধমান স্বাধীনতাকে নিঃসঙ্কোচে বাড়িয়া যাইতে দিলেন। এক লেখা-পড়া শিখিয়া ছেলে যে কখনও

বৈঠিক হইতে পারে না, এই এক মস্ত মত লইয়া সকলকে প্রভাতের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে বলিলেন; কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না—তাঁহার চিরকালের ইচ্ছা ছিল; অল্প বয়সে প্রভাতের বিবাহ দিয়া, একটি টুকটুকে ছেলেকে প্রভাতের কোলে দেখিয়া সুখে শেষের নিশ্বাস ত্যাগ করিবেন,—কিন্তু ভগবান এমন করিয়া যে তাঁহার সব সাধগুলি ভাঙ্গিয়া লয় করিয়া দিবেন, তাহা কে জানিত?

একদিন গোপনে রজনীকান্তের স্ত্রী বিন্দুবাসিনীকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ দেখি বউমা, যদি তার বিবাহে মত করাতে পার—আর ক'দিনই বা বাঁচবো আমি, প্রভাতকে সংসারী দেখে মরতে পা'রলে সুখী হতুম; তাকে আমি এতটুকু বেলা হ'তে মানুষ ক'রে এসেছি।

বিন্দুবাসিনী ফিরিয়া আসিয়া হতাশ সংবাদ দিয়া কহিল;—ঠাকুরপো তাহাকেও—সেই এক উত্তর দিয়া দিয়াছে, আরও আজ নূতন করিয়া এমন গোটাকয়েক কথা বলিয়াছে, যাহার ষোল আনা মনে করিয়া আনাই কাহারও পক্ষে অসম্ভব! তখন গোপনে পিসিমা ভগ্নী গিরিবালার বাড়ীতে খবর দিয়া দিলেন,—মনের ভাবটা, যদি দশজায়গায় দশজনার দেখিয়াও সংসারের দিকে মন যায়। গিরিবালা পূজার সময় তাহাদের দেশের বাড়ীতে ভাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল!—প্রভাত যাইতে স্বীকৃত হইল! —কিন্তু পূজার সময়টা স্নেহময়ী পিসিমাতা, প্রভাতকে কাছ ছাড়া করিয়া বিদেশে পাঠাইতে পারিলেন না;—কহিলেন—পূজার

সময় কত দেশ বিদেশের লোক ঘরে আসচে, আর ঘরের ছেলে যে বিদেশে যাবে, সে কিছুতে হ'তে পার্ব্বে না। অগত্যা পূজার পরেই যাওয়া স্থির হইয়া গেল।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে প্রভাত তাহার দিদি গিরিবালার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। ইহার আগে সে কখনও গিরিবালার বাড়ী যায় নাই—যতবার যাইতে আসিতে হইয়াছিল—দাদা রজনীকান্তই গিয়াছিলেন।

নূতন স্থানের নূতন দৃশ্যে—তাহার চিত্ত কেমন এক অজানা পুলকে নাচিয়া উঠিতে লাগিল। এখানকার আকাশ বাতাস শুদ্ধ তাহার চোখে কেমন মনোহর ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু এসব দিকে লক্ষ্য করিবার তখন তাহার তত অবসর ছিল না। কারণ, বাড়ীর দারোয়ান রামরূপ মিশির তখন তাহার মস্ত গালপাট্টা দুটা ফুলাইয়া প্রভাতের আর দুই দিন আগে না আসার দরুণ আক্ষেপ করিতেছিল। সে বলিতেছিল—আর দুই দিন আগে আসিলেই তাহাদের দাদাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিত। প্রভাত বুঝিল যে মন্মথবাবুর আর দুই দিনও অপেক্ষা সহে নাই—ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকে মাথায় রাখিয়া তিনি কর্ম্মস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। চাকরীটুকু রাখিতে বাঙ্গালীর এমনি ঐকান্তিক প্রয়াসই বটে!

দিনমানটা একরকম কাটিয়া গেল মন্দ নয়—তবু তাহার বড় ফাঁকা বোধ হইতেছিল—ভগ্নীপতি মন্মথবাবুর সহিত একবার দেখা হইল না!—আহারের সময় মন্মথবাবুর দুই ভগ্নী আসিয়া

তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছিল, তাহার বিবাহ না করার কারণ এবং তাহার সংসারে বীতশ্রদ্ধ হওয়ার হেতু কি? আরও কত কি বৃত্তান্ত, কিন্তু সে তাহাদের কোন কথার একটা সদুত্তর দেয় নাই।

সন্ধ্যার সময় পূজার দালানের রোয়াকে দাঁড়াইয়া প্রভাত এই কথাগুলি চিন্তা করিতেছিল—আর অস্তাচলাবলম্বী দিনকরের শেষ রশ্মিটি কেমন নারিকেল গাছের উপরে লাল হইতে ফিকা লালে, ফিকা লাল হইতে কেমন একটা সোণালী আভায় ক্রমেই মিশিয়া যাইতেছিল, তাহাই দেখিতেছিল। এমন সময় সহসা কে ডাকিল—প্রভাতবাবু! প্রভাত চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল—লতিকা!—মন্মথবাবুর পিস্‌তুতো ভগ্নী। তাহার দৃষ্টি যেন সহসা একটা তীব্র বিদ্যুদ্দাম বিকাশে দমিয়া গেল। লতিকা কহিল,—জল খাবে না প্রভাতবাবু? না ওই মেঘের পানে চেয়ে থাক্‌লেই পেট ভরে যাবে? একটা রহস্যের সম্বন্ধ আছে বলিয়া লতিকা প্রথম আলাপেই এতটা সাহস করিয়াছিল। প্রভাতও বলিতে যাইতেছিল—রহস্য ভাষাতেই—ভরে নাকি সুন্দরী? ঐ রূপ সমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া তাহার লহরীগুলি গণিতে গণিতে মানুষ তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা জন্ম-মৃত্যু সব ভুলিতে?—কিন্তু কথাটা নিতান্ত কবিত্বময় বলিয়া অন্তভাবে একটু হাসিয়া ও কাশিয়া কহিল,—আমাদের ত ঐ আকাশের পানে চেয়েই দিন কেটে যায়। জল না খাইলেও চলে!—লতিকা স্মিত-দৃষ্টিতে প্রভাতের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—এ জ্ঞান তা হলে আপনারও

আছে। তবু ভালো!—লতিকা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রভাতও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে সন্ধ্যাটা বড় সুখে কাটিয়া গেল। এমন রহাস্যালাপকুজিত আরামদায়িনী সন্ধ্যা, সে বুঝি তাহার বিশ বৎসরকার সারাজীবনে কখনও পায় নাই। আহারান্তে লতিকা স্বহস্তে পান সাজিয়া আনিয়া দিল। তাহার পর শালালোকের যাহা কখনই প্রাপ্য নয় লতিকা একটা কলিকায় আগুন চড়াইয়া গাল ফুলাইয়া ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রভাত ব্যস্ত হইয়া কলিকাটি লতিকার হাত হইতে কাড়িয়া হুকায় চড়াইয়া দিল। যদিও ইতিপূর্ব্বে সে কখনও তামাক খায় নাই—তথাপি আজ ধরিল!—নবীনার তামাক সাজা ব্যর্থ করিতে পারিল না!—আস্তে আস্তে তামাক টানে—আর এক একবার খুব নীচু দৃষ্টিতে অতি সন্তর্পণে নবীনার যৌবনোচ্ছ্বলিত মূর্ত্তিখানির দিকে চাহিয়া লয়। দৃষ্টিটা যেন তাহার নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই বাধাইয়া দিল।

প্রভাতও অনেক করিয়া ভাবে যথেষ্ট স্বাভাবিকতা রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিল; কিন্তু কিছুতে জড়িমার হাত এড়াইতে পারিল না। হঠাৎ এ তাহার কি হইল? প্রতিবার চাহনি-

তেঁই হৃদয়ে যেন কেমন একটা সৌন্দর্য্য স্রোত নামিয়া আইসে ! আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সুপ্ত কামনাগুলি জাগ্রত হইয়া এই সৌন্দর্য্যের পদতলে তাহার অহৈতুকী স্তব নিবেদন করিতে চাহে। কিন্তু মূঢ় ভক্তের জড়িমায় দেবতার সামান্য কৌতুক বৃদ্ধি হয় মাত্র। ইঙ্গিতে আভাষেও জানায় না যে "আমি তোমায় অনুগ্রহ করি।"

প্রভাত আর একবার লতিকার পানে চাহিতে—লতিকা ঈষদ্ধাস্যে কহিল—আগুন ধরলো আপনার, না ভাল ক'রে ফুঁ দিয়ে দেব ?

প্রভাত হাসিয়া কহিল—তুমি যাতে আগুন ধরিয়েছ লতিকা, সে কি কখনও নিবতে পারে।

লতিকা কহিল,—না ঠাট্টা নয়, সত্যি বলুন না।

প্রভাত জোরে একটা টান দিয়া তাহার কুণ্ডলায়িত ধূম বাহির করিয়া কহিল,—দেখ সে কেমন অন্তরে বাহিরেই জ্বলে উঠেছে। লতিকা চিবুকে করাঙ্গুলি দিয়া হাসিতে লাগিল, এমন সময় বিধবা নিরাভরণা মলিনা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। রমণীর নামটি যদিও মলিনা, কিন্তু তাহাতে হাসিমাথা এমন একটা ভাব ছিল, যাহা বসন্তের নিরলসা শুভ্র তটিনীর উপর অজস্র চন্দ্রকিরণ-রেখাপাতের মত সবটা দেবত্বে ও কবিত্বে মণ্ডিত। মলিনা প্রথমতঃ আসিয়া লতিকার দিকে এমন এক রহস্যবিজড়িত কটাক্ষপাত করিল, যাহাতে লতিকা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল, দিদি আমাদের সর্ব্বদা লাল হয়েই আছেন,—

বুঝি কারু কোপ কারু উপরে ঝাড়বে বলে এসেছ, কি বল দিদি ?

মলিনা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, কারু কোপ কি ? তোরই উপরে আমার যত আক্রোশ। যদি দেবতাটি ভাগ্যক্রমে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তবু তার ধ্যান ভঙ্গ না করলেই নয়। আহা, দেখ-দেখি—এমন ভাবভোলা সদাশিব ! তাপস !

লতিকা হাসিয়া কহিল, মরণ ! ঢং দেখে বাঁচি না, বুড়ো বয়সে সক্ যেন উথ্‌লে উথ্‌লে উঠছে। মলিনা কৃত্রিম কোপে চক্ষু পাকাইয়া কহিল, কি এত বড় কথা ! আমি বুড়ো ! আচ্ছা জিজ্ঞেস কর্ দেখি এই মশায়কে ? মশাই ! সত্যি বলবেন, এই যে ছাই ঢাকা আগুন, একি একদিন জগৎ গ্রাস করতে পারতো না ! আজ যদিও এ সজ্জা, তবু বলুন দেখি পুরুষের দৃষ্টি কাকে আগে পছন্দ করে ? উত্তর দিন মশায় !

প্রভাত হাসিয়া কহিল, আমি আর কি বলবো বলুন ! আমার দুইই সমান—গঙ্গা আর যমুনা—কাকে থুয়ে কার কথা বলব, যখন দুইএরই উদ্যত তরঙ্গ এসে আমার পাষাণ প্রাচীর টলিয়ে দিয়ে যাচ্চে ! 'উহুঁ হ'লোনা' বলিয়া মলিনা একখানা চেয়ার সরাইয়া লইয়া প্রভাতের কাছে আসিয়া বসিল। তার পর লতিকার দিকে আর একটা কটাক্ষ হানিয়া কহিল, বেচারা স্বামীটির দিকে যদি এমনি আগ্রহভরে চাইতিস্ লতি ! এমনি, আজ যেমন একজনার পানে চাইতিস্। এমনি এত কাছে !

"তা হলে সে শিকল ছিঁড়ে পালাতো না বোধ হয়" বলিয়া

প্রভাত কথাটা শেষ করিয়া দিল। লতিকা দুই জনেরই দিকে একটা কোপ কটাক্ষ হানিয়া কহিল, "ওই ছাড়া তোমাদের আর কি অন্য কথা নাই? আমার স্বামী আমায় যদি নাই-ই নেয়," বলিয়া চলিয়া গেল।

খুব তাড়িয়েছি, বলিয়া মলিনা চেয়ারে বসিয়া হাসিতে লাগিল। প্রভাতের দিকে চাহিয়া কহিল, তোমারও মনটা একটু দুঃখিত হলো, কেমন না প্রভাত? আচ্ছা ভাই তুমিও একটা বিয়ে ক'রে ওমনি একটা সঙ্গী জুটিয়ে নাও না!

প্রভাত মুখটা ফিরাইয়া কহিল, না—ওসব বিষয়ের আমি কোন দরকার দেখি ন

মলিনা কহিল, দরকার দেখ না ত চিরকাল এমনি কার্ত্তিকটি হয়ে থাকবে?

"এর মধ্যে ঢের কথা আছে" বলিয়া প্রভাত কথাটা পাল্টাইয়া কহিল, আচ্ছা দিদি! ওই যে লতিকার স্বামী, তিনি কেন অমন বলুন ত? আমরা ত বিবাহ করিই নাই, কিন্তু তিনি কেন বিবাহ করে নিজ পত্নী না গ্রহণ কচ্চেন।

"তিনিও যে তোমার মত বিএ পাশকরা শিক্ষিত হে" বলিয়া মুখটা ভার করিয়া কহিল, মানুষ হ'য়ে মানুষকে এতটা দুঃখ বোধ হয় কোথাও কেউ দেয় নি।

প্রভাত একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, কেন?

"কেন তবে শোন," বলিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিনোদের সব অবস্থার কথাই বলিয়া গেল। তাহার বাপ যে তাহার

আইন পড়িবার খরচ দেয় নাই. তাহারাই তাহার সব খরচ চালাইয়াছে, মায় জল খাবার পর্য্যন্ত, সেটুকুও জাঁক করিয়া বলিতে বাদ পড়িল না ! তারপর বিবাহের পর কবে কোনদিন কলেজ কামাই করিয়া বিনোদ তাহার বালিকা বধূটিকে দেখিতে আসিয়াছিল, সেটুকু শুদ্ধ পরম আগ্রহে বলিয়া গেল।

প্রভাত বলিল, এত যখন ভালবাসা ছিল, তা এখন আসেন না কেন ?

"কে জানে" বলিয়া আবার বিনোদের ওকালতী ব্যবসায়ে হতোদ্যমের কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। এই ওকালতী ব্যবসায়ই যে তাহার সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যত্ব-লোপের কারণ, একথাটা প্রভাতেরও হৃদয়ে গাঢ়তর মুদ্রিত হইয়া গেল। তাহার অন্তরটা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য ভারি বেদনাগ্রস্ত হইয়া উঠিল। হায়, লেখা-পড়া শেখার পরিণাম যদি এই মনুষ্যত্বলোপই হয়, তবে তাহার শিক্ষার কি প্রয়োজন ? প্রভাত একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মলিনার বেদনাতুর হৃদয়খানিকে আরও ভারগ্রস্ত করিয়া তুলিল। মলিনা গাঢ়স্বরে কহিল, দেখ ভাই, লতি আমাদের বড় অভাগিনী, ছেলেবেলায় মা-বাপ হারা, এখন এ বয়সকালে যদি স্বামীর সোহাগ হতে বঞ্চিত হ'লো, তবে তার মত হতভাগিনী কে আছে ?

প্রভাত আশা দিয়া কহিল, চিরকাল এদিন থাক্‌বেনা দিদি, পকেটে কিছু জমলেই আবার যে বিনোদবাবু,—সেই বিনোদবাবুই হবেন।

মলিনা কহিল সে তোমরাই বল্‌তে পার ভাই। নইলে দিতে থুতে বলো, তা আমরা যেমন দিয়েছি, একটা ঘরকন্নার সামগ্রী অন্যে তেমন দেয় না। তবু এই যদি তার নিয়তি হয়, কি কর্ব্ব—?

ইতিমধ্যে কথা-বার্ত্তা কহিতে কহিতে রাত্রি অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। পার্শ্বের এক ঘরে গিরিবালা ও লতিকা তাস খেলিতেছিল, খেলায় হারিয়া লতিকা তাহার যত আক্রোশ, বৌদির ভাইয়ের উপর ঝাড়িবে বলিয়া অকালে খেলা ভাঙ্গিয়া দিল। কারণ গিরির যখন ভাই, তখন গিরির সম্বন্ধে ভাইএর কাছে ঠাট্টাটা নিশ্চয়ই তাহার পক্ষে পরম তৃপ্তিকর হইবে না। তখন মস্ত একটা রাগ ভাঙ্গা-ভাঙ্গির ব্যাপারে অনেকেরই টান পড়িয়া যাইবে। কিন্তু তাহার চিত্তে প্রভাতের কৌতুক-হাস্যটাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাজিতেছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া ঘর হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল, প্রভাতবাবু! আপনার দিদি কতদূর খেল্‌োয়াড়, তা জান্তে পেরেছেন, কতবার গোলাম হারিয়েছেন, বলিতে বলিতে প্রভাতের ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, এখন আমার কাছে ঘাট স্বীকার না কর্‌লে ত আর ফিরিয়ে দিচ্চিনে।

গিরি হাসিয়া তাসগুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিতে লাগিল, তা বল না কেন, আমি হারলে ত? তুমি হেরেছ, তুমিই চেঁচাও বেশী!

লতিকা প্রভাতকেই মধ্যস্থ মানিয়া কহিল, আচ্ছা আপনারাই মীমাংসা করুন এর, কার কি শাস্তি পাওয়া দরকার।

প্রভাত চুপ করিয়া রহিল।

মলিনা হাসিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, আচ্ছা আমি এর মীমাংসা করে দিচ্ছি; গিরি হেরেছে, আজকের মত ও সারা রাত বিরহ-শয্যায় শয়ন করে থাকুক। আর তুই গোলাম জিতেছিস্, ওর ভাইটিকে নিয়ে দীর্ঘ দিবসের বিরহ ভুলে যা!

লতিকা লজ্জায় লাল হইয়া মলিনাকে একটা ক্ষুদ্র রকমের আঘাত করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিতে লাগিল, হাঁ, তাই বৈ কি, আমিই ত খেলাতে হেরেছি!

মলিনা-প্রভাত ও লতিকা দুইজনেরই দিকে একটা স্নিগ্ধ কটাক্ষ হানিয়া কহিল, তাতে দোষই কি লতিকা, মনে কর্না ঐ যদি আজ তোর স্বামী হ'তো, কেমন হে প্রভাতবাবু? হ'তে কি ইচ্ছাটাও করে না?

প্রভাতেরও তখন কিরূপ লজ্জায় কর্ণমূল লাল হইয়া গিয়াছিল, কোন একটা লাগ্‌সই উত্তর তাহার মুখে জোগাইল না। শুদ্ধ নীরবে হাসিতে ও কাশিতে লাগিল। মলিনা আবার জিজ্ঞাসা করিল, তোর কি মত লতি?

জড়িমার আবরণী হইতে নবোদ্ভিন্ন উষাকর-রেখাটির মত ঈষৎ রক্তিম মুখে তরুণী লতিকা তাহার দিদির গলা টিপিয়া কহিল, তোমার মুণ্ডু বাজ-আর কি?

মলিনা হাসিয়া কহিল, তবে যেখানে "না," সেই খানেই ক

"ছাঁ" কি বল হে প্রভাতবাবু ? তোমার পক্ষে এতটা বলছি—আর তুমি চুপ করে আছো ! ততক্ষণে লতিকা তাহার দিদির কণ্ঠ চাপিয়া কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। মলিনা তবু লতিকাকে প্রভাতের ঘরের দিকেই ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল ! লতিকাও ছুটিয়া বাহিরে যাইয়া কহিল—দাঁড়াও, আবার তোমার সঙ্গে একহাত লড়ছি ! বলিয়া ছুটিল—হায় ! এসময় প্রভাত একবার লতিকার লজ্জাকাতর কি আনন্দকাতর মুখখানির দিকে চাহিতেও পারিল না। প্রবল একটা বিদ্যুদ্‌রঙ্গেই সে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অপরূপ স্বপ্নময়ী হইয়া কাটিয়া গেল। সেই যে "ইচ্ছা করে না কি তার স্বামী হ'তে" এই কথাটা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহাকে কখনও উর্দ্ধে কখনও নিম্নে টানিয়া তোলপাড় করিয়া দিয়াছিল সকাল বেলাতে তখনও তাহার সে নেশা কাটিয়া যায় নাই। তাই সে যখন নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া উঠিল—তখন সে জগতের উপরে আজ অপরূপ দীপ্তরাগ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল—সে যেন শুনিল, পাখীর স্বর আজ ভিন্ন ! স্বপ্নে যে ঝঙ্কারটা শুনিয়াছিল সেই ঝঙ্কারেই আকাশ ভরিয়া রহিয়াছে, বাতাসের মৃদু উচ্ছ্বাসের মধ্যেও কি একটা গোপন রহস্যের আভাষ অনুভব করিল। চাহিয়া দেখিল ললিতার শাখে আজ অপর্য্যাপ্ত

প্রস্ফুটিত কুসুমসম্ভার। প্রভাতের চিত্ত যেন কোন্ অজানা দেশের বারতা পাইয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল! উধাও হইয়া ছুটিবার জন্য সে তাহার কল্পলোকের ডানা তুটি মেলিয়া উড়িবে কি একেবারেই মরিবে ভাবিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে, এমন সময় একদল বালক আসিয়া, তাহকে পাইয়া বলিল।—কাল কথন কথার ছলে তাহাদিগকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছু বলিবে বলিয়াছিল তাহাই তাহারা স্মরণ করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা যথন আসিয়াছে, তখন তাহাদিগকে ফিরান অনুচিত ভাবিয়া প্রভাত পূজার দালানে বসিয়া অনেকখানি লেকচারই দিয়া গেল। কহিল—ধর্ম্ম, আমাদের যা ধরে রাখে, পূজা অর্চ্চনা বিধি-নিষেধের মধ্যেই আমাদের ধর্ম্ম নাই। কর্ম্মের মধ্য দিয়াই আমাদের তা পেতে হবে, সে কর্ম্ম আবার বিশ্বহিত! লোকহিত!—সেখানে "আমি" নাই! আমি সেখানে ম'রেছে, শুদ্ধ এইটুকুর জন্যই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা যে, অসত্য হতে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে যাও। ভূমার সঙ্গে আত্মার যোগ ঘটিয়ে দাও। সেখানে ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি—

লেকচারটায় যে একটা খুব জমাট ভাব আসিয়া জমিতেছিল না, তাহা প্রভাতও বুঝিতেছিল এবং শ্রোতৃবর্গও যে না বুঝিতেছিল তাহা নহে, তবু আজকের ছন্দকে স্বচ্ছন্দগতিতে টানিয়া আনা তাহার পক্ষে একান্ত তুঃসাধ্য। তবু মোটামুটি একরকম বলিয়া গেল—ও শ্রোতৃবর্গ ও করতালি দিল, এবং সে ধ্বনি যে অন্তঃপুর-প্রকোষ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিল, তাহাও বেশ বোঝা

গেল! অবশেষে রবিবাবুর কয়েকটা ধর্ম্মপুস্তকের কথা বেমালুম নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করিয়া আপনার বক্তব্য শেষ করিয়া দিল। পাড়ার জনকতক পল্লীবৃন্দও আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, বাঃ! চমৎকার ত!—এতো সব নতুন কথা! তাহারা অভ্যর্থনা করিবার কিছুই না পাইয়া দুইহাত তুলিয়া প্রভাতকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন!—অন্তঃপুরে আয়োজন কিন্তু অন্যরূপ হইয়াছিল। সে বাড়ীর দ্বারে প্রবেশ করিতেই একটী ছোট সুন্দরী বালিকা, তাহার গলায় একটি বিনিসূতার মোটা মালা পরাইয়া দিয়া গেল। আর পার্শ্ব হইতে, দুই ভগ্নী উচ্চকণ্ঠে হুলুধ্বনি দিল। উপরে শঙ্খও কে বাজাইল যেন! প্রভাত বুঝিল যে দুই নহলা দহলা ভগ্নীর ষড়যন্ত্রেই এ ব্যাপার সাধিত হইয়াছে। না খুসি হইয়া পারিল না!—কহিল—মশায়দের এ সামান্য সন্ন্যাসীটির গ্রেপ্তারের জন্য এত আয়োজনের কোন্ প্রয়োজন ছিল না; যখন বেচারা কটাক্ষেই মরিয়া আছে।—

মলিনা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, উঁহু,—ঠিক মত জালে ফেল্‌তে আরও অনেকখানির প্রয়োজন—কারণ ওলটা নেহাত বুনো কিনা?

প্রভাত হাসিয়া কহিল, এর বাড়া আর কি ক'রবেন দিদি?

লতিকা চোক টিপিয়া কহিল, ফলেই যখন জান্তে পার্ব্বেন, তখন এত তাড়াতাড়ি কেন?

প্রভাত "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল। বাস্তবিক সেই দিন হইতে বেচারা এমন ভাবে ভিতরে বাহিরে আনন্দে ও কৌতুকে জড়িত হইয়া যাইতে লাগিল—যাহা ছাড়াইয়া আসিতে তাহার

পক্ষে অনেকখানি কষ্টকর হইয়াছিল। আহারের জলের গেলাসের ঢাকনি খুলিয়া দেখে জল নাই! অন্ন এমনভাবে কৃত্রিম শোলা-কুচিতে নির্ম্মিত, যাহা পাখার বাতাসে ঘরময় হইয়া যায়! পাণের ডিবায় পাণের পরিবর্ত্তে আরশুলার বাচ্ছা! প্রভাত যেন একটা রহস্যের সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া গেল। এ আলো অন্ধকারের উদ্বেল নর্ত্তন লীলা হইতে জাগিয়া উঠা তাহার পক্ষে যেন এখন একান্ত দুঃসাধ্য! পড়িয়া পড়িয়া কি মধুর অধঃপতন অনুভব হয়। সেদিন দ্বিপ্রহরে বাড়ীর সকলে ঘুমাইাছিল! শয্যায় শুইয়া প্রভাত জানালা-পথে, আকাশের নিবিড় নীলিমায় আপনার নয়ন-দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়াছিল!—একখণ্ড উদাস জলভরা মেঘ আকাশের সেই স্থানটা ভরিয়া দিতেছিল—আবার তথনি সরিয়া যাইতে ছিল, এইটে বেশ গাঢ়ভাবেই তাহার চোখে আসিয়া পড়িতেছিল,—মাঝে মাঝে উর্দ্ধ আকাশের—চিলের ডাকও কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল; আর হৃদয়ের মধ্যে তাহার একটা অব্যক্ত ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছিল। এমন সময় শুনিল যেন মৃদু বলয়ের শব্দ,—চোখে আলোর উপরে যেন আলোর একটা তরঙ্গ খেলিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল লতিকা!—এসময়ে কিন্তু সে লতিকার আদৌ আগমন সম্ভাবনা মনে করে তাই। সহসা এই অসম্ভাবিত সুহৃৎ-সমাগমে, তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার ছাপাইয়া যেন একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়া গেল!—সে উচ্ছ্বাস প্রেমে কূল প্লাবিত নয়—বেদনায় উন্মথিত। আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া প্রভাত উচ্ছ্বাসভরেই বলিয়া উঠিল—এই সেই রূপের

সুরা! যা—নন্দন হতে নেমে এসে মানুষকে তার জীবনে যথার্থতা জানিয়ে দিচ্চে,—যা একদিকে সুরার মত প্রবল, অ দিকে সুধার মত কল্যাণদায়িনী।

লতিকা একটা বাক্স খুলিতে খুলিতে সেখান হইতে ঈষৎ মু ফিরাইয়া কহিল, ও কি বলছেন প্রভাতবাবু? প্রভাত বালিে ভর দিয়া একেবারে খাড়া দাঁড়াইয়া কহিল, বলছিলাম সেই কথা যা দুজনের মধ্যে কথনও হয় নাই, যা জীবনের মধ্যে অপ্রকা ছিল, এ এক নূতন রহস্য-বার্ত্তা—যে তুমি উজ্জ্বল দীপশিখা, আি উন্মত্ত পতঙ্গ, আমি মৃত্যু, তুমি তাতে জীবন-লহরী—নইলে!—

"চুপ" বলিয়া লতিকা ঈষদ্ধাস্যে, প্রভাতের মুখের দিকে চাহিয় কহিল—আসুন দেখি, কথাটা না হয় পরেই কইবেন এখন এখন আমার এই বাসের শিশিটার শিপি খুলতে পারেন যদি পারেন ত আপনিও কতকটা ভাগ পাবেন অবিশ্যি—

না বলাটা কিছুতে প্রভাতের ঘটিয়া উঠিল না। এই সখের খাটুনীটুকু খাটিতে তাহার কি আগ্রহই জাগিয়া উঠিল,—কিন্তু দৈবের কি নির্ব্বন্ধ, উভয়ের হস্ত সংস্পর্শে শিশিটা এমন বেমালুম ভাঙ্গিয়া গেল, যে তাহার একবিন্দু সুবাস শিশির গায়ে থাকিল না—সবটা মেঝের উপর পড়িয়া তাহার অনাস্বাদিত গন্ধে ঘর ভরাইতে লাগিল। সহস্র বকুল বেলার সদ্যঃ প্রস্ফুটিত সুবাস-উদগার! দোষী দুইজন নীরবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া স্মিত-হাস্যে পরস্পরকে দোষী ঠাওরাইতেছে, এমন সময় বাহিরে কাহার দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। প্রভাত কহিল, কে বল দেখি?—

লতিকা কহিল,—দিদি কিন্তু কি বল্‌বে,—এই ভাঙ্গা শিশি দেখে ?—

দুই জনেই তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় মলিনা সশব্দে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া শিকল তুলিয়া দিল, বার বার সহস্র মিনতিতেও দ্বার খুলিয়া দিল না ; উপরন্তু মালিনীমাসির দোহাই দিয়া এমন এক ছড়া কাটিয়া গেল যে, দুই জনেরই তাহাতে লজ্জায় কর্ণমূল লাল হইয়া গেল। প্রভাত কহিল, এসো লতিকা, যখন বিপাকে পড়া গিয়েছে, তখন এম্নি অবস্থাতেই কিছুক্ষণ থাকা যাক্।

লতিকা কহিল, দাঁড়ান আগে দিদির গঙ্গা-যাত্রাটার ব্যবস্থা করে তবে আমি বের হচ্চি—বলিয়া দেরাজের কাছে গিয়া, দেরাজ হইতে উলের বাণ্ডিল,—কাঁটা,—অৰ্দ্ধপ্রস্তুত মোজার বাক্স বাহির করিয়া কহিতে লাগিল "এইগুলো সব জানলা গলিয়ে ফেলে দেব, তবে নিশ্চিন্ত হবো"—এই বলিয়া ক্রমাগতই সেগুলা বাহির করিয়া স্তূপীকৃত করিতে লাগিল !—কিন্তু যে উদ্দেশ্যে লতিকার এ অভিমানের আয়োজন, তাহা তাহার ব্যর্থ হইয়াছিল ; কারণ মলিনা জানিত, এই দ্রব্যগুলিতে তাহারও যে পরিমাণে টান আছে, লতিকারও তাহার কম নাই। সুতরাং সে নিশ্চিন্ত হইয়াই বাহিরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল, আর শুধু ব্যাকুল প্রভাত একটি চকিত করুণ দৃষ্টি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যখনই লতিকা সেগুলা রাগ করিয়া ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইবে, তখনই বাধা দিয়া বলিবে "আহা, কাজ নাই।" অভিমান যখন একান্ত রূঢ়, প্রেম তখন

এম্নি সজাগ যে আপনার বক্ষ দিয়া প্রিয়তমার যত্ন-লালিত দ্রব্য গুলি রক্ষা করিতে উদ্যত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রভাত কহিল,—দিদি! এইবার আমি যাবো, আর আমার থাকলে কিছুতে চল্‌ছে না। ' গিরি বাধা দিয়া কহিল, না ভাই কতদিন আসো নাই—আর দুটো দিন থেকে যাও।

প্রভাত কিছুতে সম্মত হইতে চাহিল না। কহিল, এম্নি করে দুদিনের যায়গায় আবার দুদিন বাড়িয়ে তুলবে।

মলিনা আসিয়া কহিল, দরকার নাই ভাই, এখুনিই বেরিয়ে পড়ো, কাজের লোক তুমি, কত কাজেরই না জানি ক্ষতি হচ্চে! তুমি না গেলে হয়ত বা লাটই বিকিয়ে যাবে!—

প্রভাত ঈষৎ হাসির সহিত ক্ষুণ্নস্বরে কহিল, না দিদি! কতদিন এসেছি তুমিই বল না? না হয় দাদা কিছু না ব'ললেন, কিন্তু তবু আমি সংসারের মধ্যে আছি ত যাই হোক একটা গরু ভেড়ার মধ্যে।—

মলিনা হাসিয়া কহিল, হাঁ, আছো নিশ্চয়ই! তার জন্য আর কারু কিছু হোক না হোক, বুড়ি পিসিমাটাও ছট্‌ফট্ ক'রে থাকেন।

এমন সময় অমেঘবাহিনী লতিকাবালা আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই কহিল, কি হ'য়েছে দিদি? বাহির হইতে সে ইহার কতকটা শুনিয়াও ছিল। কিন্তু আপনাকে ঠিক এটা

বিশ্বাস করিতে দেয় নাই, ভাবিতেছিল এর মধ্যেই প্রভাতবাবু চলে যাবেন! কবে এলেন?

মলিনা কহিল, হবে আর কি লতি! প্রভাতবাবু যে চলে যাচ্ছেন!

লতিকা চকিতে একবার প্রভাতের মুখের দিকে চাহিয়া তারপর দিদির একটু খানি গা ঘেঁসিয়া গদ্গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—ইস্ তাই বৈকি? তা কিছুতে হচ্চেনা, প্রভাতবাবুকে এখনও ত পাঁচটিদিন যেতে দিচ্চি না।

মলিনা হাসিয়া কহিল, "দিচ্চিনা বল্লেই কে শুনবে? ওকি তোর নিজের লোকটি যে,—

লতিকা দিদির মুখ টিপিয়া ধরিয়া তাহার অসমাপ্ত কথা মুখেই মিশাইয়া দিয়া কহিল—না, কক্‌খনই না—প্রভাতবাবু আমার অনুরোধে আর পাঁচটি দিন-থাকবেনই।—

লতিকার এই আগ্রহ, আর দিদি মলিনার এই অনুরোধ, যুগপৎ তাহার হৃদয়ে বেপথু সঞ্চার করিয়া দিল। সে কিছুতে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, তাহার জন্য তাহাদের এ আগ্রহ হওয়ার কি প্রয়োজন ছিল। সে যখন সামান্য কুটুম্বপুত্র ব্যতীত আর কেহই নয়। তবু সে তাহার উত্তরে না ভিন্ন "হুঁ।" কিছুতে বলিতে পারিল না। যেন জোর করিয়া কে তাহার ইচ্ছার টুঁটি চাপিয়া হত্যা করিয়া গেল। প্রভাতের হৃদয় তার জন্য অনেক-খানি অশ্রু উদ্বেলও হইয়াছিল, কিন্তু সে এত গোপনে তাহা সম্বরণ করিয়া গেল যে কাহাকেও তাহার ব্যথা জানিতে দিল না।

মলিনা কহিল, তাহলে নিশ্চয়ই যাবে ভাই?

প্রভাত কহিল, হাঁ দিদি—

মলিনা কহিল, তাহলে আবার এসো!—এ কদিন সব এ সঙ্গে ছিলুম বড় আনন্দে ছিলুম—

প্রভাত কহিল, আমিও বড় আনন্দে ছিলুম দিদি। লতিক বলিতে যাইতেছিল—কেন আর দুই দিন থাকিয়া—এ আনন্দ সম্ভোগটা আরও দুই দিন ভোগ করলেই বা কি ক্ষতি হইতেছিল কিন্তু, দিদি ও ভাজের সামনে দাঁড়াইয়া এ কথাটা বলা তাহার একান্ত দুরূহ হইয়া দাঁড়াইল। শুদ্ধ দুটি তার করুণ আঁখি দিয়া প্রভাতের কাছে অভিযোগ করিল—নিষ্ঠুর এতটুকুর জন্য এ আয়োজনের কি দরকার ছিল? প্রভাতও জানাইল তার নয়ন দৃষ্টিতে—সুন্দরী ক্ষণিকের মিলনানন্দটুকুই আমাদের চির জীবনের বিরহ নিশায় ধ্রুব তারাটির মত জেগে থাকবে।

বিদায়ের ক্ষণ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। গুরুজন-দিগকে প্রণাম করিয়া প্রভাত গাড়ীতে চড়িল। বাড়ীর দরজাতেই গাড়ি আসিয়াছিল। দিদি রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, আবার এসো ভাই! মা বাপ হারা ছোট ভাই আমার।—ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়িয়া স্নেহময়ী ভগ্নীর চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনে সকলেই বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছিল। লতিকার চক্ষুও ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু সে সবলে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহা দমন করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মলিনা অগ্রসর হইয়া প্রভাতের হাত দুটি ধরিয়া

নভাবে সস্নেহে [illegible] দেখে ভাই আবার এসো ! একবারে ভুলে যেয়ো না, এ কদিন বড় সুখেই ছিলুম। আর বিয়ে থা ক'রবো না বলে বৃথা উদাসী সেজো না—দাদা, পিসিমা যা বলেন শুনো—এখন তোমার জ্ঞান হয়েছে লেখা পড়াও শিখেছ।

প্রভাতের হৃদয় তখন কি[illegible] অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, কাহারও কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না, শুদ্ধ সকলের দিকে একটা করুণ চাহনি চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। নলিনা আবার কহিল, [illegible] এক আধখান চিঠি লিখো।

প্রভাত কষ্টে হাঁ বলিয়া উত্তর দিল। স্নেহবন্ধন-নিপীড়িত-প্রভাত উদ্বেল হৃদয়ে গাড়ীর পশ্চাতের খড়্‌খড়ি দিয়া যতক্ষণ দৃষ্টি চলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চাহিয়া রহিল। দেখিল একে একে সকলেই বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল, সকলের শেষে লতিকাও মুখে কাপড়টি দিয়া গাড়ীখানার দিকে একটা উদাস মর্ম্মভেদী চাহনি হানিয়া চলিয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলিয়া গেল। প্রভাতের মনে হইল দীর্ঘশ্বাসটা যেন তাহার অতি নিকটে বুকের উপর দিয়াই বহিয়া গেল। বুকে খানিক হাত রাখিয়া তারপর ব্যাগ হইতে একখানা বই টানিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ক্ষণে ক্ষণে একটা স্মৃতি, একটা সুকুমার স্মৃতি—

তাহার কল্পনারাজ্যের উপর দিয়া উদ্বেল কুহক্ তুলিয়া—বহিয়া যাইতে লাগিল। তখন সে বই ফেলিয়া শুনিতে লাগিল, যেন কোন সুদূর কালে—কোন্ বিরহী কবি তাহার অশ্রু-গুঞ্জরিত গাথায় গাহিতেছে,—

"চেখে চোখে যারে রাখিবারে সাধ,—
পলক ফেলিতে ঘটিল বিষাদ, এম্নি প্রেমের ছলনা।"

গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দের সঙ্গে এই গীত-ধ্বনি যেন তাহা পঞ্জরে পঞ্জরে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাড়ী আসিয়া প্রভাতের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। এইটুকুর জন্য সে কিন্তু আদৌ প্রস্তুত ছিল না, মন সর্ব্বদা অন্যমনস্ক,আহার বিহার শুদ্ধ অরুচিকর, নিকুঞ্জবনের ভিতর হইতে পাখী যেন কোন্ মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রভাত নিজেই নিজের অবস্থাটা বুঝিয়া ভারি অপ্রতিভ হইয়া গেল। কিন্তু আপনাকে ঠিক্ রাখিবার সে ক্ষমতা তাহার আর নাই, সে যেন তাহা কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে ধর্ম্ম। আরাধনাতেও চিত্ত সুস্থির হয় না, কোথা হইতে কি একটা বিপ্লব আসিয়া তাহার হৃদয়ের সব সুন্দরকে মলিন করিয়া দেয়। দীর্ঘ দিনরাত্রির সুদীর্ঘ অবসরে সেই চিন্তা, সেই স্মৃতি—সেই ভিন্ন আর তাহার কিছু নাই— প্রভাত যখন জাগিয়া উঠে, তখন সূর্য্যকিরণে তাহারই দীপ্তরাগ চোখের উপরে ভাসিয়া পড়ে; অপরাহ্নে নদীতীরে বেড়াইতে গেলে, শুনিতে পায় নদী যেন উজান গতিতে, তাহারই হৃদয়ের কথা অশ্রু মর্ম্মর ভাষায় প্রকাশ করিতেছে, আকাশের চন্দ্র নক্ষত্রের দীপ্তিতে তারই দুটি করুণ আঁখিকে জাগাইয়া দেয়—নেশা এতই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল।

পিসিমা রজনীকান্তকে কাঁদিয়া কহিলেন, প্রভাতকে দেখবার কেউ নাই? বাছা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চে, অথচ সবাই নিশ্চিন্তে আছে, এত ছেলে মানুষের পূজা আচ্ছা তপ জপ কি সয়?

রজনীকান্ত কিছু জানিনা বলিয়া পিসিমার কথাটাকে নিতান্ত তুচ্ছভাবে উড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। পিসিমা বুঝিলেন মা বাপ নাই, ভাই আর ভাইয়ের ভাবনা কতটুকু ভাবিবে? যতটুকুও বা ভাইএর হৃদয় ছিল, তার অনেকখানি এখন আর একজন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভাতের কাছে গিয়া কহিলেন "বাবা বল্ দেখি তোর কি ভাবনা? ছেলে মানুষ এখন হ'তে তোর এত ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা কেন? এখন খাবি বেড়াবি হাস্‌বি মাথ্‌বি, তা নয়? একি?

প্রভাত হাসিয়া রাগিয়া পিসিমাকে কোন প্রকারে ভাগাইয়া দিয়া কহিল, আমার কিচ্ছু হয় নাই, আমি বেশ নিশ্চিন্তে আছি! কিন্তু হা রে মায়ের হৃদয়! শুদ্ধ এই কথাতে সে কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে?

বিন্দুবাসিনীকে কহিলেন, বউমা তুমি যদি এর কোন উপায় ক'রতে পারো, আমার ত ভাবনায় রাত্রে ঘুম হয় না, আমার তেমন প্রভাত, কালী হয়ে যাচ্ছে!—

বিন্দু কহিল, আমি কি উপায় ক'র্ব্বো বাছা, ঠাকুরপোর এতটা বয়স হ'লো তবু একটা বে দিলে না, ছেলে আব্দার কর্লে যে বে —ক'র্ব্বো না, তোমরাও অম্নি চুপ করে গেলে, হবেই ত রোগ— খুব গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে।—

পিসিমা তাঁহার দুই স্নেহ ছল ছল ব্যগ্র আঁখির আতঙ্ক চাহ
চাহিয়া কহিলেন, বল কি ? তাহলে আমার প্রভাতের কি হবে
হাঁ বউমা ? প্রভাতের জন্য তাঁহার হৃদয় এমন ব্যাকুল যে তাহ
সম্বন্ধে কোন একটা অনিষ্ট চিন্তা মনে স্থান দেওয়াও তাঁহার পে
এখন একান্ত অসম্ভব। ব্যাকুল ভাবে বার বার কহিতে লাগিলে
তা হলে কি হবে বউমা ?

বিন্দু কহিল, হবে আবার কি ? এ বয়সে আমরা ত জা
নারীই পুরুষের সব ব্যথার ব্যথী, সঙ্গী জুটিয়ে দাও—কখন
এতটা থাক্‌বে না বলেই আমার বিশ্বাস !

"আর মা বিবাহ—! সে আগে বাঁচুক তারপর ভগবান য
দিন দেন," বলিয়া প্রবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

বিন্দু দেখিল, বেচারী পিসিমার আজ আর ভ্রাতুষ্পুত্রের জ
ভরসা করিবার সে ক্ষমতাটুকুও আর নাই। ভাবিল আচ্ছা এব
বার ভাল করিয়া দেখাই যাউক না। সেই সময় প্রভাতও সেখা
আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্যই তাহার চেহারা অনেকটা বিশ্রী
হইয়া গিয়াছিল।

বিন্দু সস্নেহে কহিল,—ঠাকুরপো কথা রাখ্‌বে ? রাখো য
তা হ'লে একটা কথা তোমায় ব'ল্‌বো ?

প্রভাত কহিল, কি ?

বিন্দু কহিল, বেশী নয়। যদি তুমি স্বীকার পাও যে আমা
কথার উত্তর দেবে, তা হ'লেই ব'ল্‌বো—নইলে নয়।

"এমন ব্যাপার ? আচ্ছা না হয় আমি স্বীকারই পেলাম—" বলিয়া প্রভাত মাথা চুলকাইতে লাগিল।

বিন্দু কথা পাড়িয়া দেখিল, আগেকার মত প্রভাত বিবাহের নামে, একেবারে লাফাইয়া উঠিল না, বরং যেন একটু কোমল-ভাবে কহিল, বিবাহ সে আমার মত তাপসের জন্য কেন ?

বিন্দু সাহস পাইয়া প্রভাতকে ধরিয়া বসিল। সারাদিন ধরিয়া টানা টানিতে প্রভাত স্বীকার পাইল, বিবাহ করিতে যে কখনও নারাজী ছিল তাহা নয়, তবে সংসারে অভাবটা বেশী, আর মাথায় ভাবটাও প্রবল, এই কারণে কখনও ইহাতে মত দেয় নাই। তবে যদি কেহ তাহার অভাব অভিযোগ গুলা চিরকাল মাথায় করিয়া বহিতে পারে, তবে সে বিবাহ করিতে রাজী আছে; দুর্ভাবনার হাত হইতে এড়াইবার জন্য প্রভাত আজ ইহার অপেক্ষা বেশী করিতে পারিত। বিন্দু কহিল, আমরা থাকতে তোমায় গায়ে কোন অভাবেরই আঁচ লাগতে দেব না। কথাটা পাকাপাকি করিয়া বিন্দু পিসিমাকে শুভসংবাদ দিল, পিসিমা সানন্দে গলিয়া তিনি আর কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন—কহিলেন, তোমার সিঁথির সিন্দুর চির-উজ্জ্বল থাকুক্ মা—তুমি পাকা হাতে নোওা পরো।—

দাদা রজনীকান্তও এ সংবাদে অল্প আনন্দিত হইলেন না, ভাবিলেন যাই হোক ছোড়াটা এদ্দিন পরেও যদি মানুষের মত মানুষ হ'য়ে ওঠে।

শুভদিনে শুভক্ষণে একটা ছোট খাটো পরীর মত সুন্দরী

ঝিয়ের সহিত প্রভাতের বিবাহ হইয়া গেল। বরপক্ষ কন্যা
কোন পক্ষেই অতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্য ছিল না। ইহাতে প
প্রতিবেশী প্রচুর বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল, অনেকে কৃপ
ঘরকন্না বলিয়া অপবাদও দিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাহাদের বি
আসিয়া যায় নাই। তবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের বি
হইয়াছিল, কন্যার দরিদ্র পিতামাতার—তাহারা স্বপ্নেও ভাবে ন
এমন লেখাপড়া জানা জামাই আসিয়া তাহাদের ভাঙ্গা ঘর আ
করিবে। আমরা এ বিষয়ে পাকা রিপোর্ট দিতেছি, এ বিষ
প্রভাতেরই ষোল আনা হাত ছিল। সে আজকালকার অধিকা
সভ্যগৃহস্থের মত কন্যার দরিদ্র পিতাকে পীড়ন করিয়া টা
আদায়টাকে খুব ঘৃণার চক্ষেই দেখিত এবং এই হেতু এ বিবা
একটি পয়সা পণ স্বরূপ গ্রহণ করে নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মেয়েটির নাম চারুশীলা। তাহার নামটি যেমন কোম
মুখখানিও তেমনি শ্রীভরা, প্রভাত ভাবিল বেশ হইল, আ
তাহাকে পরের ভাবনা ভাবিতে হইবে না। দূর হইতে তাহা
ভাবখানি, ভঙ্গিমাটুকু—ভারি মনোরম ঠেকিতে লাগিল। কি
ব্যবহার করিতে যাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চিত্ত বে
সুস্থির হইতে পারিল না। প্রভাত কোন একটা কথা কহিলেই বলে
আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, আমার মার জন্য বড় মন কেমন

ক'চ্ছে, এমন চাঁদের আলো, এমন দক্ষিণা বায় কিছুতে সে একটা উত্তর দেয় না! কেবলি বলে "পাঠিয়ে দাও"।

যে আশায় সে তার সোণার জগতের মধ্যে স্ত্রীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী করিবে বলিয়া ভাবিতেছিল, তাহার সে সোণার স্বপ্নটা একটা মরীচিকার দীপ্তি হানিয়া মরুতেই মিলাইয়া গেল। কান্না থামিতেই যখন তার দিন যায়। স্বর্গের প্রথম ভিত্তিস্থাপনেই যখন এতটা গলদ—তখন আর দ্বিতীয়বারের জন্য অপেক্ষা-তাহার সহিল না। বিন্দুবাসিনীকে গললগ্নীকৃত-বাসে কহিল, দোহাই বৌদিদি, চারুকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

বিন্দু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিল, হাঁ তা দেব বৈকি? সে কাকে নিয়ে থাকবে, সেটি হচ্ছে না।

প্রভাত কহিল, "আমি ব'লছি বৌদিদি, ওর কোন কষ্ট হবে না। ওর স্বামীর সঙ্গ অপেক্ষা,—গাঁয়ের কানাই বালকের সঙ্গ—ঢের"—বিন্দু কথাটা শেষ করিতে না দিয়া কহিল, তুমি ক্ষেপ্‌লে নাকি ঠাকুর পো? মেয়ে মানুষের স্বামীর সঙ্গ অপেক্ষা আর কোন বড় সঙ্গ আছে? একথা কেউ ব'লতে পারে? আজ চারু ছেলে মানুষ আছে, এত দিন সেখানে কাটিয়েছে, মন কেমন করে বৈ কি?

প্রভাত হাঁ না কোন একটা উত্তর না' দিয়া যেন কতকটা রোষ ভরেই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। বিন্দু ভাবিল, তাহার ঠাকুরপোটি একবারে গাছ পাকা ফল হাতে করিতে চাহে, দুদিনের সবুর সহে না। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা হে আচ্ছা তাই

হবে। চারুকে আমরা বাপের বাড়ী পাঠাই আর না পাঠা
তোমার কাছে না পাঠাইলেই ত হ'চ্চে।

প্রভাত কহিল হাঁ!

বৈরাগ্য আবার দ্বিগুণভাবে জাগিয়া উঠিল, আহারে বিহা
এমন পুরদস্তুর ঔদাসিন্য ইতি পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। আ
বিবাহই করিব না বলিত এবার কিন্তু পুরা সন্ন্যাসী সাজিয়া রঙ্গমে
উপনীত হইল। পায়ে খড়ম, মাথায় লম্বিত কেশদাম, মৃগচ
বিছাইয়া শয়ন, সর্ব্বদা গীতা পাঠ, সকলের তাক্ লাগিয়া গেল
এখন ছেলে ঘরে টিঁকিলে হয়। ভাবনায় ভাবনায় পিসিমার
পেটের ভাত চাল হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি নিজে সারাদি
ধরিয়া চারুকে মাজিয়া ঘসিয়া কপালে টিপ্ কাটিয়া সন্ধ্যার দিকে
প্রভাতের গৃহাভিমুখী করিতে প্রসাস পান, কিন্তু প্রভাত বাহি
হইতেই বলিয়া পাঠায় বাহিরের ঘরেই তার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে
পীড়াপীড়িতে তাহার জেদ আরও বাড়িয়া যায়, তখন আর কে
তাহাকে বাড়ীর দিকে লওয়াইতে পারে না। পিসিমা কাঁদিতে
কাঁদিতে গিয়া আপনার ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দেন। বালিকার
সাধের বাসর ভাঙ্গিয়া যায়। প্রসাধন উন্মোচন করিতে করিতে
তাহারও দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া আইসে, ভাবে হায় ঈশ্বর তাহাকে
এমন এতটুকু ক্ষুদ্র করিয়া গড়িয়াছিলেন যে, তাহার উপযুক্ত
স্বামীর জন্য এতটুকু উপযুক্ত করিয়া তোলেন নাই! দীপ নিবাইয়া,
আঁধার শয্যায় শুইয়া সে তাহার হৃদয়ের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া
বলিতে থাকে, ওগো এসো তুমি, আমি বালিকা! আমাকে

তোমার স্পর্শ দাও! আমার দলগুলি ফুটাও! আমি অযোগ্য, তুমি নিজগুণে আমায় যোগ্য করিয়া নাও।

প্রভাত বসিয়া বসিয়া সব খবরই গ্রহণ করে, আর একটা নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়া, তাহার এই নিষ্ঠুরতাকে আরও নিষ্ঠুরতর করিয়া তুলিতে থাকে, এক একবার হৃদয়ের স্বভাব অনুকম্পায় মনে করে; না এ সবের আর দরকার নাই, যেমন ছিলাম তেমনি থাকি, কিন্তু তখনি কেমন রক্তের মত একটা নেশা তাহাকে চাপিয়া ধরে, এই নিষ্ঠুরতাকে কেমন সয়তানের হাসির মত ভাল লাগে, সে কিছুতে ক্ষান্ত হইতে পারে না, যেন এই রক্ত-সমুদ্র মন্থন করিয়াই, একটা রহস্যের আবিষ্কার করিয়া দেখিতে চাহে, তাহার মধ্যে কি আছে? নহিলে সে নিজেও বেশ বুঝিয়াছিল, এ তাহার সন্ন্যাসও নহে, বৈরাগ্যও নহে, একটা নিষ্ঠুর রকম রক্ত-রাঙা উল্লাস।

এমন সময় ভগ্নীপতি মন্মথনাথবাবু আসিয়া এ বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গিরিবালাও তখন সেখানে ছিল। গিরির মুখে সমস্ত শুনিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন এর জন্য তোমার বাপের বাড়ীতে এত ভাবনা, গিরি কহিল, দেখ না ছোট ভাই—দুটো নয় পাঁচটা নয়, কোথায় সুখে ঘরকন্না ক'রবে, আমরা দেখে সুখী হবো, তা নয় একেবারে পরমহংস হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

মন্মথবাবু প্রভাতকে ডাকিয়া কহিলেন, কি হে ভায়া তা হ'লে আমার সঙ্গে পশ্চিমে যাবে, সেখানে দেখ্‌বে রাস্তায় রাস্তায় সাধু সন্ন্যাসীর মেলা ব'সেছে, তোমার উচুদরের সঙ্গী মিলে যাবে।

প্রভাত উচুদরের সঙ্গীদের জন্যই ব্যস্ত ছিল না,—সে ব্যা
ছিল আপনাকে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে,—চিত্তের এই প্রকার
ক্ষোভ-ক্ষিন্নভাব কিছুতে তাহার ভাল লাগিতে ছিল না। মন্মথবা
না বলিলেও আপনিই সে দেশভ্রমণের কথা পাড়িত। কারণ তা
জানা ছিল দেশভ্রমণে যতটা চিত্ত স্থির হয় এতটা আর কিছুতে
নয়। জানাইল সে রাজী আছে। যাইবার কালে পিসিমা অনেব
কাঁদিলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল না, প্রভাতকে এ সময় চোখের আড়াল
করেন, মন্মথবাবু যখন, গোপনে খুব ভরষা দিয়া গেলেন, তখন
অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। চারুর মুখের দিকে চাহিয়া
কহিলেন, প্রভাত আমাদের ভুলে থাক্‌তে পারবে, কিন্তু সে
সতীলক্ষ্মীর আকর্ষণ কিছুতে এড়াতে পারবে না—বলিয়া চারু-
শীলার ললাটে একটা ক্ষুদ্র চুম্বন করিলেন, চারুর চক্ষু দুটি ছল ছল
করিয়া উঠিল। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানিতে স্বামীর জন্য যে আজ
কি ব্যাকুলতা, তাহা নারী-হৃদয় ভিন্ন কে বুঝিবে?

চারিদিকে প্রকৃতির নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রভাত
কয়েক দিনে এলাহাবাদে উপস্থিত হইল। এলাহাবাদে
প্রবেশ করিবার আগেই বাহিরের খোলা বাতাস খাইয়া, তাহার
চিত্ত যেন অনেকটা সুস্থির হইয়া গিয়াছিল। যখন সে বাড়ীর
দরজায় আসিয়া গাড়ী হইতে নামিল, তখন যেন অনেকটা পূর্ব্ব
জীবন ফিরিয়া পাইল। এখানকার আকাশ বাতাস যেন তাহার
সব বন্ধন টুটিয়া দিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইল। মুক্তির
প্রাচুর্য্যে সুস্থির হইয়া, বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া আছে, এমন

সময় হঠাৎ শুনিল যেন কাহার কণ্ঠস্বর,—এ স্বর ত সে বহুদিন শোনে নাই,—তাহার সন্ন্যাস-কঠোর বক্ষে দ্রুত রক্ত-স্রোত বহিয়া গেল। ভাবিয়া দেখিতে লাগিল। সত্যই কি লতিকা-বালা—একবার অনেক দিন সে শুনিয়াছিল বটে, লতিকা পশ্চিমে স্বাস্থ্য বদলাইতে আসিয়াছে, এতদিনও যে সে এখানে আছে, তা ত শোনে নাই। মনের ব্যগ্র উত্তেজনায় বাড়ীর বুড়া চাকটার কাছে এ সম্বন্ধে নিট্ খবরটা জানিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু "লতিকা" কথাটাই তাহার পক্ষে এত গুরুতর হইয়া পড়িল যে, সে কিছুতেই তাহা—ব্যক্ত করিতে পারিল না। বাড়ীটার ভিতরে গিয়া কিন্তু তাহার সব গোল কাটিয়া গেল। দেখিল সত্যই সেই ছবি—যা সে তার জীবনের প্রথম উন্মেষ-প্রভাতে দেখিয়াছিল, একখানি চিত্রিত প্রতিমার মত, একটি স্বপ্ন-রচিত স্বপ্নখণ্ডের মত! যার স্পর্শ তার প্রাণের মধ্যে জাগিয়াছিল গান—হাসিতে যার স্বর্গের সুষমা ঝ'ড়ে প'ড়েছিল। দেখিল কল্প লোকে সেই সারভূত সৌন্দর্য্য সত্তার। স্মৃতি যার জীবনের পাতায় পাতায় একটা স্বর্ণ প্রতিবিম্ব লইয়া মুদ্রিত হইয়া আছে, দেখিল সেই উষা লোকের তরুণী প্রতিমা, তাহার অন্ধকার জীবনের পারে প্রভাত নক্ষত্রটির মত উজ্জ্বল হইয়া আছে। ভক্ত অবনত হইয়া দেবীর কাছে নত হইল।

* * *

পশ্চিমের হাওয়া একদিকে যেমন তাহার শরীরকে স্বাস্থ্যময় করিয়া তুলিতেছিল, অন্যদিকে লতিকার হাসি ও সঙ্গ তাহার

প্রাণের পূর্ণতা ঢালিয়া দিতেছিল। চারিদিক হইতে একটা অপূ
পুলকোচ্ছ্বাস তাহাকে যেন মাতাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল
এবং এই পুলকোচ্ছ্বাসে কখন সে তাহার আমিত্বটাকে হারাই
ফেলিয়াছিল, তাহা সে বোধই করিতে পারে নাই। হঠাৎ একদি
জাগরিত হইয়া দেখিল, সম্পূর্ণ তার পরাজয় হইয়াছে, তাহার ৫
বৈরাগ্যও নাই উচ্চ সপ্তকও নাই, এখন সে দীন—পৃথিবীর ধূলি
কণার মত একান্ত দীন।—অধঃপতনটা বেশ ভালরূপে হৃদয়ঙ্গ
করিয়া একদিন প্রভাত মন্মথবাবুকে কহিল, কই মন্মথবাবু য
মনে করে এসেছিলাম তা ত হলো না, যদি দৈবাৎ কোন দিন এব
সাধু পুরুষের দর্শন হয়, দ্বিতীয় দিন আর তাঁর দেখাই নাই।

মন্মথবাবু কহিলেন, ঐটুকু আর বুঝছো না ভাই! সাধু মানু
ষের ঐটুকুই ত বিশেষত্ব "শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ"

প্রভাত হাসিয়া উঠিল। মন্মথবাবু আর কোন কথা কহিবাঃ
পূর্ব্বে লতিকা, সেই ঘরে পান দিতে আসিয়াছিল। কহিল, দাদা
ও ভণ্ড মানুষদের সঙ্গে তুমি এত বকো কেন? ওরা বাইরে সাধু
হয়ে থাকতে চান, কিন্তু ভিতরে কু মতলব ছাড়া আর কিছু নাই।

"তাই সত্যি নাকি" বলিয়া মন্মথবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া
উঠিলেন। কহিলেন, লতি ত আচ্ছা আবিষ্কার ক'রেছে।

প্রভাত তাহার দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল, কি আমি
ভণ্ড? এত দিনের পর এই আবিষ্কারটা হ'লো আপনাদের?
আচ্ছা আমি জানতে চাই আমি কোন্ খানটায় ভণ্ড! কথায়
ভণ্ড—না কাজে ভণ্ড?

সে প্রমাণ করবার ভার আমার নয়—বলিয়া আস্তে মন্মথবাবু উঠিয়া গেলেন।

প্রভাত দুইবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—ফিরুন্ মন্মথবাবু কথাটা প্রমাণ করেই দিয়ে যান!

মন্মথবাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন আমার কাজ আছে—আর ফিরিলেন না। অগত্যা প্রভাতকে লতিকাকে লইয়া পড়িতে হইল! লতিকাও চলিয়া যাইতেছিল, প্রভাত তাহার অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আচ্ছা বলো আমি কিসে ভণ্ড? কোন খানটায় আমার ভণ্ডামি দেখলে!

লতিকা একটা কোপ কটাক্ষ হানিয়া কহিল, মন্দ নন্ আপনি—বলুন দেখি ঠিক ভেবে?

প্রভাত স্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর আস্তে আস্তে লতিকার অঞ্চলটা ছাড়িয়া দিয়া করুণ নেত্রে কহিল, সত্যই সুন্দরী—আমি ভণ্ড। আমি এই রকম ভণ্ডই থাকৃতে পারি, যদি তুমি আমায় ভণ্ড বলে শাসাও।

লতিকা "চুপ্" বলিয়া একটা মধুর হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। প্রভাত বিছানায় পড়িয়া অপূর্ব্ব পুলকে একখানা বইএর পাত উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। পড়ায় মন ত আদৌ লাগিল না। কেবলি অপেক্ষা করিতে লাগিল, কখন লতিকা আবার আসিবে,—আসিয়া আবার তাহাকে ভণ্ড বলিবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন লতিকা আসিল না, তখন পান আনিবার ছুতায় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। লতিকা তখন অপরাহ্ণ

বেলায় রামায়ণ পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। পাশে লখি
ঝীটা বসিয়াছিল।

প্রভাত "পান" চাহিতেই লতিকা গর্জ্জিয়া কহিল, কোথা
হে পান,—আমি রোজ রোজ মশাইএর জন্য এত পান সে
দিতে পারি না, মাইনে টাইনে কিছু থাই ব'লতে পারেন ?

প্রভাত এ কৃত্রিম কোপের অর্থ বুঝিত, হাসিয়া কহিল, মাই
নাই থাও সাজিয়া দিলে হানি কি ?

লতিকা বইটা বন্ধ করিয়া কহিল, কি হবে সেজে দিলে, প
কালের কিছু কাজ হবে ব'লতে পারেন ?

প্রভাত "দারকার নাই" বলিয়া যথন নিজেই পান সাজি
উদ্যত হইল, তথন লতিকা তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া নিজে
পান সাজিতে লাগিয়া গেল। কাছে বসিয়া লখিয়া তাহাদের এ
ছেলেমানুষী দেখিয়া হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, সে
হাসিতে লাগিল।

প্রভাত লখিয়ার কাণ বাঁচাইয়া কহিল। লতিকা, আমি যেম
তোমায় দেথবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র—তুমিত তেমন নও।

লতিকাও লখিয়ার কাণ বাঁচাইয়া কহিল, এ কি মানুষে
রকম ? আমি কে ? আমায় দেথ্‌লে কি হবে ? তারপ
একটু উচ্চকণ্ঠে কহিল, কেন এ ভালবাসাটা নিজের স্ত্রীর উপ
দিলেই ভাল হয় না কি ?

প্রভাত কহিল কেন ? তুমি বুঝি ভালবাসার যোগ্য পা
নও—কেমন না ?

লতিকা একটা রহস্যভরা কটাক্ষ হানিয়া পানটা প্রভাতের হাতে দিয়া কহিল। জানি না কতই রকম মানুষের মধ্যে আছে। অতিথি পান চিবাইতে লাগিল কি অমৃত চিবাইতে লাগিল তাহা বুঝিতে পারিল না, সেইখানেই বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিয়া গেল। যে কথা তাহাদের দুইজনকার মধ্যে কতবার হইয়া গিয়াছে তাহাই, কত রহস্যের তারে তারে কত সাবধান সঙ্কোচের ভিতর দিয়া একটা বিচিত্র লীলায় উৎসারিত হইয়া যাইতে লাগিল। ভাষায় তাহা নিতান্ত সামান্য হইতে পারে, কিন্তু জীবনের মধ্যে, সে একটা ভাবিবার জিনিষ।

লখিয়া দেখিল, যখন তাহাদের আসর জমিয়া উঠিয়াছে, তখন সে আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। সেদিন আর তাহার রামায়ণ পাঠ শোনা হইল না।

বড় আনন্দ ও কৌতুকে তাহাদের দিন যাইতেছিল। ইহার মধ্যে বিচ্ছেদের কল্পনাও কেহ করে নাই,—এমন সময় হঠাৎ একদিন বাড়ী হইতে লতিকাকে দেশে পাঠাইবার জন্য পত্র আসিল। পত্রে মলিনা লিখিয়াছে যে, এতদিনে তাহাদের জামাই বিনোদবাবুর চিত্ত স্থির হইয়াছে, তিনি এখন ওকালতী ছাড়িয়া, দেশের একটা স্কুলে মাষ্টারী করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সেখানে নিজের স্ত্রীকে লইয়া যাইবেন, এই কারণ লতিকা, সারুক, আর তাই সারুক পত্রপাঠ তাহার পাঠানের বন্দোবস্ত চাই-ই। একটা বজ্রদণ্ডের মত পত্রখানা যেন প্রভাতের বুকটা ডলিয়া চলিয়া দিয়া গেল। শুষ্ক মুখে লতিকাকে কহিল, কি লতি ? তা হ'লে চ'ল্‌লে ?

লতিকা কোন উত্তর দিতে পারিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া, যেম পান সাজিতে ছিল তেমনি সাজিতে লাগিল।

প্রভাত ধরাকণ্ঠে কহিল—যাও তুমি সুখী হও। তোমা সুখেই আমার সুখ! আজ হ'তে আমার মধ্যে জীবনব্যাপী একা বহ্নিচক্রের আয়োজন—তবু তোমার সুখ হবে ভেবে, সে বহ্নিতে আমি চাপা দিচ্চি! কাঁদ্ছি না রক্ত দিয়ে বক্ষের ক্ষত ভরিে তুলছি। ব'লবোও না তুমি আমার কতখানি ছিলে! শুদ্ধ তু সুখী হও! স্বামীর সোহাগ ভোগ করো! আমাদের ভুলে যাও ভগবানের কাছে এই মাত্র প্রার্থনা কচ্চি।

লতিকাও সে সময় কিছু বলিতে পারিল না,—শুদ্ধ একবা করুণভাবে প্রভাতের মুখের দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে আপনা ঘরের দিকে উঠিয়া গেল। উঠিয়া সেখানে তাহার কি মনে হইতে লাগিল! ঘরের যে কাজেই যায়, থাকিয়া থাকিয়া কোথা হইতে কি একটা ব্যাথা, পাথরের ভারের মত তার সমস্ত বুকটা জুড়িয় বসে! নারী ভাবিল, একি হইল প্রভাত ত তাহার কেউই নয় তবে এ রকম কেন হয়? হাসিও আসে, লজ্জাও পায়! আবার কান্নাও চাপে।

ভাদ্রের প্রকৃতি-লীলার মত জীবনের মধ্যে এ কিসের লীলা চলিতে লাগিল। ওপারে দূরে খানিকটা চিকি মিকি স্বর্ণকিরণ, আর এপারে খানিকটা কিসের এ বর্ষণ। মেঘ নাই অথচ বৃষ্টি কোথা হইতে আইসে? বিছানায় শুইয়া ক্ষণে ক্ষণে লতিকার, প্রভাতের অপকট সরল বাক্যগুলি মনে পড়িতেছিল। এমন সময়

গিরিবালা আসিয়া কহিল, কি লতিকা শুয়ে রয়েছিস যে—কোথায় যেতে হবে মনে নাই?

লতিকা কিছু উত্তর না দিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল, গিরি কহিল, আজিই যে যাত্রার দিন, এত দিনের পর তোর দেবতা ডাক দিয়েছেন, তবু এখনও তুই নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছিস্!

লতিকা উঠিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, সত্যি বৌদিদি, এতদিন তোমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে ছিলুম বড় সুখে ছিলুম। তুমি আমায় মায়ের মত, দিদির মত, যত্ন করেছ,—আর সে চক্ষের জল রাখিতে পারিল না, গিরি স্বহস্তে লতিকার মুখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, আবার আস্‌বি ভাই, যতদিন বেঁচে থাকবো, তোকে বছর বছর আন্‌বোই!

লতিকা গদ্গদ কণ্ঠে কহিল, দেখ বৌদিদি, আমার মা নাই, বাপ নাই, তোমরাই আমার বাপ মা সব। উদ্বেলিত অশ্রু-তরঙ্গে দুই নারীই অভিষিক্ত হইতে লাগিল। ঝি আসিয়া খবর দিল যাত্রার আর বিলম্ব নাই, বাবু ব'লে পাঠালেন রাত্রি নয়টার মধ্যেই রওনা হ'তে হবে।

লতিকা, পোর্টম্যান্‌টা গোছাইতে লাগিল। মনের একান্ত অভিলাষ,—এই সময় একবার প্রভাত আইসে, তাহা হইলে, তাহাকে তাহাদের বাড়ী যাইতে অনুরোধ করিয়া যাইবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন প্রভাত আসিল না—তখন মনে করিল একবার ঝিকে দিয়ে ডাকিয়া পাঠাই, কিন্তু কি অছি-

লায় ডাকা হয়? অছিলাটা মনে না পড়ায় তাহাও ঘটিয়া উঠিল না। বাহিরের বারান্দার কাছে, একবার উচ্চকণ্ঠে গলার সাড় দিল। কিন্তু কই প্রভাত! পানগুলা ঝির হাতে দিয়া প্রভাতের কাছে পাঠাইয়া দিল। হায় এ সময়ও প্রভাত একবার আসিল না! নারী জানিত না, যে কি ঝটিকাই তাহার বক্ষে বহিয়া যাইতেছিল। রাত্রি নটার সময় মন্মথবাবু ভগ্নীকে লইয়া ট্রেণের দিকে যাত্রা করিলেন। প্রভাত সঙ্কল্প করিয়াছিল তাহাদিগকে ট্রেণ পর্য্যন্ত তুলিয়া দিয়া আসিবে, তাহার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু যাত্রাকলে মন্মথবাবু যখন কোনরূপ আহ্বান করিলেন না, তখন সে চুপ করিয়া লতিকার বিদায়-দৃশ্য দেখিল,—সেমিজের উপর সাড়ীখানি পরিয়া লতিকা অশ্রু মুছিতে মুছিতে চলিল, তাহাই দেখিতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইল তাহাদের সঙ্গে সে ও তখনই দেশে যায়, কিন্তু মন্মথবাবু বলিয়াছেন তিনি না আসা পর্য্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। কথাটা মনে পড়িয়া চুপ করিয়া গেল। বসন্তের চাঁদ উজ্জ্বল আভা বিস্তার করিয়া আকাশে হাসিতে লাগিল। আর একজন সেই চাঁদের আলোয় মাথা গুঁজিয়া আপনার হৃদয়ের চাঁদ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। লতিকা! লতিকা! কোথায় রে লতিকা? মত্ত মাতঙ্গ তাহার লতা ছিন্ন করিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে! ট্রেণের শব্দ তাহার বুকখানা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া বহিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তার পরদিন নানা ছুতায় প্রভাত দিনের বেলায় আদৌ বাড়ীতে প্রবেশ করিল না। এখানে সেখানে কাটাইয়া দিয়া সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গিরিবালা তাহাকে জল খাইতে দিল। সে খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিল মাত্র। গিরিবালা কহিল, কোন অসুখ করে নাই ত প্রভাত?

প্রভাত কহিল, কোন অসুখ করে নাই, ভালই আছে সে!—

গিরি তবু আশ্বস্ত হইতে পারিল না। কহিল, আজ আর তোমার বাইরে বেড়িয়ে কাজ নাই। ওপরে আলো দিয়ে আসা হ'য়েছে, তুমি যাও।

প্রভাতও কতকটা তাহাই চায়। ভাবিল নিরালা ঘরে মুখ গুঁজিয়া অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবে। বারান্দার ধারে আসিতেই তাহার হৃদয় যেন—কি যেন স্পর্শে চকিত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল এইখানে সে বারান্দার রেলিংএ ভর দিয়া দাঁড়াইত, আর লতিকা তাহার সম্মুখে পান সাজিতে বসিত। পান সাজিতে সাজিতে কত কথাই তাহাদের হইয়া যাইত। যে কথা কতবার দু-জনায় মধ্যে হইয়া গিয়াছে, তাহারি পুনরালোচনায় এমন কত সন্ধ্যা কত নিশিথ কাটিয়া গিয়াছে। একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষ পর্য্যন্ত আসিয়া বক্ষেই মিলাইয়া গেল। সেদিনকার সেই মালাগাছটি পর্য্যন্ত লতিকা যেভাবে দেওয়ালে দোলাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তেমনি আছে। বকুলমালার রংএর পরিবর্ত্তন হইয়াছে,

কিন্তু গন্ধ এখনও তাহার স্পর্শ লইয়া বহিয়া যাইতেছে। মনের একাগ্র উত্তেজনায় একবার সেটা স্পর্শ করিতে চাহিল, কিন্তু তখনি আপনার দিক হইতে বাধা পাইয়া চুপ করিয়া গেল। ভাবিল তাই ত, তাহাকে আমার ভালবাসিবার অধিকারটুকু মাত্র আছে, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিবার—তাহাতে আসক্তির ভাব জাগ্রত করিয়া, তাহাকে সঙ্গ-সুখ দিবার অধিকার ত আমার নাই। সে চিন্তাও মনে আনা অন্যায় ও পাপ। আকাশের দিকে হাত জোড় করিয়া কহিল, ঈশ্বর তাকে সুখে রেখো, সে অসহায় দীন, তাকে তার প্রেমাস্পদের কাছে শুভদৃষ্টিতে স্থাপিত করো! মনের আবেগে আরও অনেকখানি বলিয়া গেল। কিন্তু আজ এ শক্তি আসিল কোথা হইতে? যার বলে সে এতখানি বলিতে পারিল, শুদ্ধ ভালবাসার খাতিরে এতটা সে যে পারিবে, প্রভাতও তাহা কখন কল্পনা করে নাই। হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত খুঁজিয়া দেখিল, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র দুর্ব্বলতা আছে কি না?—নাই! শুদ্ধ উদার মহান্ ভালবাসা, এ ভিন্ন আর কিছুই নাই। প্রার্থনা করিল,—ঈশ্বর রেখো এই প্রেম চির অটুট, যেন সারা জীবনের পথে শুদ্ধ তাহা চোখের নেশায় মাত্র পর্য্যবসিত না হয়। এমন সময় গিরি আবার আসিয়া ডাকিল, প্রভাত!—

প্রভাত কহিল, কি দিদি?

গিরি কহিল, বাইরে এতক্ষণ বসে আছো, এ তো ভাল করো নাই, আমি জানি—ছেলে বেলা হ'তে তোমার বাইরের ঠাণ্ডায় থাকা সয় না।

প্রভাত উত্তর দিল,—না দিদি ! আজকের এই দক্ষিণের বাতাস আমার বেশ লাগ্‌ছে। গিরি ভাবিল—যা ভেবেছিলাম নিশ্চয় তাই। তাহার মনে বড় আক্ষেপ হইতে লাগিল যে, কেন সে প্রভাত ও লতিকাকে এত ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকিতে দিয়াছিল। বেদনায় তাহার বক্ষস্থল আলোড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু সে কি সান্ত্বনা দিবে ? দুটো একটা ধর্ম্মের কথা পাড়িয়া প্রভাতের মুখ দিয়া তাহারই সদর্থ করিয়া লইবার চেষ্টা করিল। প্রভাত উত্তর দিল বটে, কিন্তু তাহার বেশ মনঃপূত হইল না। তখন গিরি প্রভাতকে শীঘ্র বাড়ী পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। মন্মথ না আসা পর্য্যন্ত তাহাকে আদৌ বাড়ী হইতে বাহির হইতে দিল না, এবং মন্মথ আসিতেই নানা উপদেশের মালা পরাইয়া তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দিল। যাইবার আগে প্রভাত কহিল, এত তাড়াতাড়ি কেন মন্মথবাবু ?"

মন্মথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, কেন ? তুমি কি কচি খোকাটি আছো, বুঝতে পাচ্ছো না ! ঘরে যে ষোল বছুরে পত্নী রেখে এসেছো—মনে নাই ?—

প্রভাত হাসিয়া কহিল,—ষোল বছুরে হ'লে কি আজ দুরান্তরে হাওয়া খেতে বেড়াতুম ?

মন্মথ হাসিয়া কহিলেন, উঃ ভুল হ'য়েছিল, তখন তোর দাদাকে আমার একখানা চিঠি লিখ্‌লেই ঠিক হ'তো যে, আজ কালকার ইচড়ে পাকা ছেলেদের জন্য ইচড়ে পাকা বউও চাই, মানে—তাদের তর সয় না।—আমি তোর দিদিকে কত বৎসর বিবাহ

করেছিলাম, জানিস্? তখন সবে মাত্র উনি নয় বৎসরের
প্রভাত কোন উত্তর না দিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। মন্ম
বাবু কহিলেন, যাই হোক বাড়ী যাবি, আমি ফুলধনু সেখানে রে
এসেছি, কোন প্রকারে স্ত্রীর অমর্য্যাদা করিস না। আমাদে
বাঙ্গালী ঘরের মেয়ের মত মেয়ে কোথাও আছেরে পাগল! কত
গুলো ইংরাজী বইই পড়েছিস্ ত কেবল?

প্রভাত কহিল, তাতে কি হয়েছে তাই বলুন না!

মন্মথ কহিল, দেখেছিস্ কোথাও এমন স্বামীর জন্য তদগত
প্রাণা স্বামীর সুখে সুখী, স্বামীর দুঃখে দুঃখী, এমন স্বামি-সর্ব্ব
নারী জগতে আর কোনও দেশে আছে? নিতান্ত অধম দী
দুঃখীর ঘরেও স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা আর কোন দেশে হ
কি? সাধে কি কবি গেয়েছেন—

কোথা হেন শতদল বুকে করি পরিমল
থাকে পতি মুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে
বঙ্গবালা-মধু বিনা মধু কোথা কুসুমে?

প্রভাত আর বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই বুঝিয়া হাসিতে
হাসিতে উঠিয়া গেল। মন্মথ কহিলেন, লোকটা বদ্ধ পাগল
বঙ্গবালা যে কি জিনিষ, তাহা এখনও বুঝিল না, শুধু বই প'ড়ে
কি হবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এলাহাবাদ হইতে বৈদ্যনাথ ও রাজমহল ঘুরিয়া যাইতে নির্দ্দিষ্ট
[স]ময়ের দিন কতক পরে গিয়া প্রভাত বাড়ীতে উপস্থিত হইল।
পিসিমা প্রভাতের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "এলিরে বাপ্।
এদ্দিন ধরে নয়নের মণি হারা হ'য়েছিলাম"। বাড়ীতে আহার
আয়োজনের ধুম পড়িয়া গেল!

বিন্দুবাসিনী কহিল, কি ঠাকুরপো এলে, মনটা এইবার স্থির
হয়ে গেছে ত?

প্রভাত কহিল, সে খবরের প্রয়োজন তোমাদের?

বিন্দু কহিল, প্রয়োজন আছে বৈ কি, নইলে জিজ্ঞেস্‌বোই বা
কেন?

প্রভাত কহিল, তবু শুনি কি প্রয়োজনটা?

বিন্দু মুখ টিপিয়া কহিল, সেখানকার লতিকাবালার সঙ্গে
কেমন আলাপটা জমেছিল, তাই বল্‌ছিলাম।

প্রভাত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, লতিকা? লতি-
কাকে তোমরা কেমন করে জানলে?

বিন্দু কহিল, হাঁ গো লতিকাই! তুমি মনে করেছ, লতি-
কাকে বুঝি তুমিই কেবল জানো, আর কেউ জানে না! তারা
কাল যে আমাদের বাড়ী হয়ে স্বামি-স্ত্রীতে কেঁদুয়াখালী গেল।

প্রভাত সাগ্রহে কহিল, কি রকম শুনি?

বিন্দু কহিল, স্বামী তার চাকরী স্থানে যাচ্ছিলেন, তাই পত্নীকে

সঙ্গে করে নিয়ে যেতে, পথে দুর্য্যোগের দরুন আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

প্রভাত আবার কহিল,—কাল? এই গত কাল? তাহার বড় আক্ষেপ হইতে লাগিল, কাল সে কেন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। তাহা হইলে অন্ততঃ আর একবারও লতিকার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিত।

বিন্দু কহিল, হাঁ কালই তাঁ'রা এসেছিলেন।

প্রভাত কহিল, আমি ত এর কিচ্ছু শুনি নাই, শুনি তারপর?

বিন্দু হাসিয়া কহিল, তারপর আর কি? লতিকা তোমায় একটি বড় জিনিষ দান ক'রে গেছে, খুব গোপনে, রত্নটি কিন্তু আমার কাছেই জমা রেখে গেছে সে,—বুঝেছ!

প্রভাত কথাটা যেন ভাল বুঝিতে পারে নাই। এইভাবে কহিল কি? ব্যাপারটা ত ভাল বুঝতে পার্লাম না!

বিন্দু কহিল, সে ত পার্বেই না। লতিকা তোমায় একটি রত্ন দান ক'রে গেছে, আর ব'লে গেছে এ লতিকার দত্ত ব'লে প্রভাতবাবু অবশ্য গ্রহণ কর্বেনই।

প্রভাত অবাক্ হইয়া বিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিন্দু হাসিতে হাসিতে কহিল, ভয় নাই, ওগো সে রত্ন আমার কাছেই জমা আছে, মিলিয়ে দেব এখন! বলিয়া চলিয়া গেল। প্রভাত এ রহস্যের কিছু মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না! ভাবিল, হয় ত লতিকা কোন অভিজ্ঞান তাহার জন্য রাখিয়া গিয়াছে, আবার ভাবিল তাও কি সম্ভব? নানা চিন্তা আসিয়া

তাহাকে দোলাইতে লাগিল। একবার ভাবিল, না হয় বৌদিদিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা যাক্,—সে রত্ন কি? কিন্তু সামান্য একটা বিষয়ের জন্য মনের এই গাঢ় উত্তেজনা বাহিরে প্রকাশ করা ঠিক নয় বিবেচনা করিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রের আহার শেষ হইলে বিন্দুবাসিনী কহিল, ঠাকুরপো! আজ আর তোমার বাইরে যাওয়া হবে না।

প্রভাত কহিল, কেন?

বিন্দু কহিল, দরকার আছে বলিয়া চুপি চুপি কাছে গিয়া কহিল, মনে নাই সেই রত্নটি।

প্রভাত "আচ্ছা" বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে চটিটা পায়ে দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। এদিকে পিসিমা বিন্দুবাসিনীকে কহিলেন, রেখে দাও বউমা তোমার অন্য কাজ, আগে চারুকে নিয়ে প্রভাতের ঘরে দিয়ে এ'সো।

বিন্দু কহিল, এত তাড়াতাড়ি কেন পিসিমা; আমি ত নিয়ে যাবার জন্যই আয়োজন কচ্চি!

পিসিমা মালা জপিতে জপিতে কহিলেন, চারু লক্ষ্মীমা কেঁদ না যেন আজ।

বিন্দু কহিল, কাঁদবে কেন, ওরও কি প্রাণ স্বামীর জন্য এতটুকু আকুল হয় নাই? আর কি ও ছেলেমানুষটি আছে, ঠাকুরপোও আজ কিছুতে ঠেলতে পার্বে না। সেদিনকার সে মুখ হ'তে আজকের এ মুখের জৌলুষ ঢের বেড়ে গেছে। চারুর হাতে পানের ডিবাটি দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিন্দু উপরে একবারে

প্রভাতের ঘরে উপস্থিত হইল। চারু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। বিন্দু ডাকিল, এ'স চারু।

চারু এক পা অগ্রসর হইয়া, আর পারিল না, স্বামীর বিনা আহ্বানে আর কি করিয়া যাওয়া যায়, তাহার স্বভাবঅভিমান গর্ব্বিতনারীত্বটা যেন লজ্জায় ও দুঃখে পাণ্ডুর হইয়া যাইতেছিল বিন্দু জোর করিয়া টানিয়া প্রভাতের হাত ও চারুর হাত একত্র করিয়া কহিল, এই দান বুঝেছ ঠাকুরপো! লতিকা এই রত্ন তোমায় দান ক'রে গেছে! আমরা তোমায় "এ" নেওয়াতে পারিনি কিন্তু লতিকা গর্ব্ব ক'রে ব'লে গেছে, শুদ্ধ আমার খাতিরে প্রভাত এ দান—এই স্ত্রী গ্রহণ কর্ব্বেনই।

প্রভাতের একবারে তাক্ লাগিয়া গেল! এমন ব্যাপার ত সে কল্পনাও করে নাই। বিন্দু কহিল, বাস্তবিক ঠাকুর পো এ সামান্য দান নয়। চেয়ে দেখ দেখি এ কি রত্ন?

চারুর অবগুণ্ঠনটা উন্মোচন করিয়া দিয়া কহিল—দেখ দেখি এই অশ্রুধোয়া মুখ, এ মুখ কখনও তোমার বিরুদ্ধে "না" ব'লতে পারে?

প্রভাত চকিতে একবার চারুর মুখখানা দেখিয়া লইল, ভাবিল তাইত! আজ ত তাহাতে বালিকার সে কাতরতা নাই! তাহার মনে হইল, এইবার যেন তাহার দৃষ্টির উপর হইতে কালো যবনিকা অপসারিত হইয়া গেল। এতদিনে যেন **শুভদৃষ্টি** হইল। নিজেকে অনেকটা আরাম বোধ করিয়া আর একবার প্রভাত চকিতে তাহার বালিকা স্ত্রীর মুখখানি দেখিয়া লইল।

অবগুণ্ঠনের ভিতরে এই কমনীয়তাটুকু তাহার ভারি মধুর ঠেকিল। বিন্দু কহিল, আজ হ'তে সম্পূর্ণরূপে চারু তোমার হাতে প'ড়লো। এখন তুমি তাকে পায়ে ঠেল—আর মাথায় রাখো। সত্যি, কি বলবো তোমায়; তুমি এলাহাবাদ গেলে চারুকে তোমার জন্য গোপনে কত চোকের জল ফেলতে দেখেছি। ভেবো না—এ মিথ্যা, সত্যই তোমার জন্য ও কেঁদে-ছিল। সত্যই।—

প্রভাতের তখন ভিতরে যাহাই হইতে থাকুক, বাহিরে কিন্তু খুব খানিকটা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ কেঁদেছিল সত্যই, কিন্তু সে তার বাপের জন্যই নিশ্চয়,আমার জন্য ত নয়-ই। আমি তার কে?

একথায় চারু চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাহার বসনাঞ্চল ইতস্ততঃ সরিয়া স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। বিন্দু বাধা দিয়া কহিল, ঠাকুরপো কি তুমি ছেলে মানুষের মত বকো,—তার ঠিক নাই তুমি আর যাই বলো তুমি তার কে—একথা কিছুতেই ব'লতে পার্বে না! তুমি ত মেয়ে মানুষের মন জান না, তোমায় কেমন ক'রে বুঝাব ব'লো। তবু তুমি জেনে রেখো, যে মেয়েমানুষ তার বাপের বাড়ীর জন্য কাঁদতে পারে, স্বামীর জন্য সে যে আরও খুব বেশীই পারে, তাতে ভুলটি নাই। দরকার হ'লে নিজের প্রাণটাকেও অনায়াসে স্বামীর জন্য দিতে পারে।

প্রভাত "উত্তম" বলিয়া বৌদিদিকে বিদায় দিয়া, আশ্চর্য্য হইয়া চারুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে যে এই কয়মাসের মধ্যেই এমনভাবে বাড়িয়া উঠিবে, তাহা সে আদৌ ভাবে নাই।

তাহার মুখে চোখে যেন একটা অপরূপ লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়া
আগে যে শুধু সর্ব্বদা সরমে সঙ্কুচিত হইয়া লুকাইয়া রহিত,
সে বিকাশোন্মুখতার একটা পরিপূর্ণ আভাস লইয়া কম্পিত
চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এখন একবার শুধু দক্ষিণা বায়ু বহি
হয়;—যেন রূপার খাটে, রূপার মত ঝকঝকে বিছানায় রাজ
রূপার কাঠিতে মৃত হইয়া আছে, এখন রাজপুত্র আসিয়া সো
কাঠিতে জিয়াইয়া লইলেই হয়। প্রভাত আস্তে আস্তে চা
অবগুণ্ঠনটা ঈষৎ টানিয়া ডাকিল, চারু!—

চারু বিছানার ধারটিতে অপরাধীটির মত বসিয়া পড়ি
একটা উত্তর দিবার সামর্থ্য তাহার কুলাইয়া উঠিল না।
যদি প্রভাতের অন্তর দৃষ্টিটা আরও পরিষ্কার হইয়া যাইত,
দেখিত—চারুর গোপন হৃদয়তলে স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য
অগাধ আত্মবিসর্জ্জনের আয়োজনই স্তূপীভূত হইয়া আছে,
প্রভাত আবার ডাকিল "এসো চারু, তোমার হৃদয় এই
আমি অনেকটা বুঝতে পেরেছি! তুমি খুবই কেঁদেছিলে, না?

বালিকা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না। তাহার হৃদ
সমস্ত ঘনীভূত অপরাধ-রাশি অশ্রু-জলে সিক্ত করিয়া স্বামী
চরণে ঢালিয়া দিল। প্রভাতও আর স্থির থাকিতে পারিল
অন্ততঃ লতিকার অনুরোধটাও বলিয়া তাহার চোখের অশ্রু মু
ইয়া দিল। তারপর কি জানি কেন তাহাকে একটা আগ্র
বুকের কাছে টানিয়া লইয়া একটা চুম্বনও না করিয়া থাকি
পারিল না। চারু কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল। আমি অপরা

লে তুমি কেন সে অপরাধ নিলে? তুমি কেন আমায় শুধরে লে না? আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, তুমি না শিখালে আমায় কে খাবে? তুমি কেন আমায় শিখালে না?—

প্রভাত চারুকে দুই ব্যগ্র বাহুতে বেষ্টন করিয়া কহিল, সে মারি বুদ্ধির দোষে চারু! আমিই বুঝি নাই যে ঘরের মধ্যেই মি আছো! আমার স্ত্রী—ভরসা—শান্তি! বৃথাই দূরে গিয়াছলাম।

দূরের বাঁশী মিলনের গান গাহিয়া উঠিল। সারারাত্রি ধরিয়া রুর বাহুপাশে বদ্ধ হইয়া প্রভাত ভাবিতে লাগিল লতিকার নের কথা। হাঁ দান বটে! ইহাই মস্ত দান! সে আজ তাহার ষ্টি দান দিয়া চলিয়া গেছে!
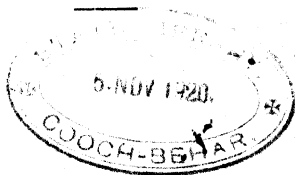
নিদয়া।

(১)

আধা বয়সে দুই শত টাকা পণ দিয়া সৃষ্টিধর যখন চঞ্চলাকে বিবাহ করিয়া আনে, তখন চঞ্চলার বয়স দশ বৎসর। সৃষ্টিরও সংসারে আর কেহ ছিল না। মনে করিয়াছিল—বালিকা পত্নী-টির হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্তে শেষের দিন কয়টা একটু সুখে শান্তিতে কাটাইয়া যাইবে।

কিন্তু "হাদে দিদি বিধি হ'ল বাম" প্রথমটা আসিয়াই চঞ্চলা কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিতে লাগিল, যে, সৃষ্টির বড় দুঃখ হইল। ভাবিল কি অন্যায়ই করিয়াছি! তারপর অনেক কষ্টে খেলনা নূতন কাপড় চোপড় ইত্যাদিতে যদিও কথঞ্চিৎ শান্ত হইল;—কিন্তু সৃষ্টির উপর বক্র হইয়াই রহিল। তাহাকে দুটো রাঁধিয়া বাড়িয়া দেওয়া ত দূরের কথা, নিজের পরণের কাপড়খানা পর্য্যন্ত কাচিত না—সৃষ্টিকেই মাঠ হইতে খাটিয়া খুটিয়া আসিয়া একই সঙ্গে রান্না বাড়া এবং পরিধানের কাপড়খানা পর্য্যন্ত কাচিয়া দিতে হইত।

লোকে হাসিত, ঠাট্টা করিত, বলিত—সৃষ্টি বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিলে ভাল! সৃষ্টি নীরবেই সমস্ত শুনিয়া যাইত। নিজের এই কার্য্যের জন্য দুঃখিত হইয়াছে বলিয়াও বোধ হইত না, স্ত্রীর নাম

লইলেই অবুঝ স্ত্রীর' পরে একটা সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুকম্পায় তাহার সমস্ত মুখে একটা অপূর্ব্ব স্নেহের রেখা ফুটিয়া উঠিত, একান্ত কেহ চাপিয়া ধরিলে এবং স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইবার প্রস্তাব তুলিলে বলিত—এখনও অবুঝ আছে, একটু বড় হইলেই সারিয়া যাইবে। কিন্তু দ্বাদশ, ক্রমে ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ—পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল, তবু চঞ্চলার আর বোধ হইল না! স্বামীর স্কন্ধে সেই প্রথমে যেমন বিনা সঙ্কোচে আরোহণ করিয়াছিল, এখনও সেইরূপ স্কন্ধের বোঝা হইয়াই রহিল! কিন্তু বেচারাকে একটু নিষ্কৃতি দিয়া হাঁপ ছাড়িবার অবসর দিল না! কিন্তু সৃষ্টির তাহাতে দুঃখ নাই ; সে যে চঞ্চলাকে ভালবাসিতে পারিয়াছে, এই অনুভবে তাহার সমস্ত বক্ষ ভরিয়া রহিল!

একদিন আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার সময় মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সৃষ্টি ডাকিল—চঞ্চলা!

চঞ্চলা ঘরের মধ্যে তখন পাড়ার নবীনবোসের পুত্র কুমারী-শকে দিয়া তাহার মাসীর বাড়ীতে একখানা পত্র লিখাইতেছিল! তাহার মা বাপ কেহ ছিল না ;—মাসীই তাহাকে মানুষ করিয়া বিবাহ দিয়াছিল। স্বামীর আহ্বানে মুখটা বেজার করিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল,—কি বলো? মাগো,—একখানা পত্র লেখবারও অবসর নেই!

সৃষ্টি কহিল, আমাকে এক ঘটী জল দিবি চঞ্চলা, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

চঞ্চলা অঞ্চল দোলাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—আমার এত অবসর নেই, তুমি নিজেই গড়িয়ে নাও গে—

সৃষ্টি কহিল, হারে, আমাকে জল দেওয়ার চাইতে তো চিঠি লেখাটাই বেশী হ'লো ? হাঁরে—কথার স্বরে একটা ক্ষোভ জাগিয়া উঠিল।

চঞ্চলা কহিল, তুমি কি আমার একখানা চিঠি লিখে দিতে পারো, লিখ্‌তে জানো ?

কুমারীশ বয়সে কিশোর হইলেও নারীর এই কথায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। চঞ্চলাকে কহিল, জলটা দিয়েই এসো না, খেটে খুটে এলো !

চঞ্চলা উঠিয়া জল দিয়া আসিয়া আবার কুমারীশের কাছে বসিয়া পত্র লেখাইতে লাগিল। কহিল, কি লিখ্‌লে বলো দেখি ?

কুমারীশ কহিল, যা বলেছো তাই লিখেছি।

চঞ্চলা কহিল, আর একটু লিখে দাও, আর আমাকে এই আষাঢ় মাসের মধ্যে নিয়ে যায় যেন। আর আমি এখানে থাক্‌তে পাচ্ছি না।

সৃষ্টির কর্ণেও কথাটা প্রবেশ করিল, সে তখন তামাক সাজিতেছিল, কহিল—তুমি তোকে মার্‌ছি না ধরছি ?

সৃষ্টি ছেলেবেলা হইতে চঞ্চলাকে মানুষ করিয়াছিল বলিয়া তুই তোকারিই করিত।

চঞ্চলা কহিল, আমি কি তাই লেখাচ্চি নাকি, আমি তোমার ঘরে থাক্‌তে পার্ব্বো না, তাই মাসীমাকে জানাচ্ছি।

সৃষ্টি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এখনও চঞ্চলা বালিকাই রহিয়াছে, কিন্তু সঙ্কল্প করিল—তাহার এ ভুল ভাঙ্গাইতে হইবে,—তাহাকে জানাইতে হইবে—আমি তার স্বামী আর এই স্বামীর ঘরই নারীর একমাত্র আশ্রয়-স্থল। তৎপরে সে নীরবে তামাক টানিতে লাগিল। চঞ্চলা বাক্স খুলিয়া খামের দরুণ কয়টা পয়সা কুমারীশের হাতে দিয়া সৃষ্টিকে আদেশ করিল—কুমারীশকে তাহাদের বাড়ীর দুয়ার পর্য্যন্ত রাখিয়া আইস।

সৃষ্টি তামাক টানিতে টানিতেই কুমারীশের সঙ্গে দাঁড়াইতে গেল। পথে একবার সসঙ্কোচে সৃষ্টি কুমারীশকে জিজ্ঞাসা করিল হাঁ ভাই, সত্য চঞ্চলা—যা বল্লে, তাই চিঠিতে লিখে দিলে নাকি?

কুমারীশ কহিল, না সৃষ্টিদা, তুমি কি আমাকে তাই পেলে! তোমার বউএর বোধশোধ নাই বলে কি আমাদেরও নাই। আমি মুখে বল্লাম বটে, যে, যা বল্লে তাই লিখে দিলাম, কিন্তু আসলে তা নয়।

সৃষ্টি কহিল, বেশ বেশ ভাই। যা বলবে তাই অমনি লিখে দিও না। ইস্কুলে প'ড়ছো—দুকথা বেশ বানিয়ে তোমরাও ত লিখতে পারো, তাই লিখে দেবে। আর আর ত খাওয়া মাথা-রও কষ্ট নাই।

কুমারীশ কহিল, তা কি আমরাও দেখতে পাচ্চি না, কষ্টে-সৃষ্টে যা রোজগার করো, সে ত তোমার বউই সব খেয়ে ফেলে, একটি কথাও তুমি বলো না।

সৃষ্টি কহিল, না ভাই আমিও কিছু বলিনা, ভাবি—ছেলে

মানুষ, কেউ সঙ্গী সাথী নাই, খাওয়া মাথাতে যদি ভুলে থাকে ; তাই কিছু বলি না।

কুমারীশ মনে মনে হাসিয়া কহিল, বেশ নির্ব্বোধের মত চঞ্চলা তোমাকে ঠকাইতেছে ! আর তুমি ভাল বাসিয়া নিশ্চিন্ত আছো। কুমারীশ যেন চঞ্চলা সম্বন্ধে অনেকখানি কথাই জানিত। শুধু সে ইস্কুলের বালক বলিয়া ফুটিয়া বলিতে তাহার বাধো বাধো ঠেকিত মাত্র। বাড়ীর দ্বারে পৌছিয়া সৃষ্টিকে বিদায় দিয়া কহিল—যাও। সৃষ্টি ফিরিয়া আসিল।

(২)

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সৃষ্টি দেখিল, চঞ্চলা এখনও বিছানায় পড়িয়া ঘুমায় নাই। ইহার আগে এত রাত্রিতে সে অগাধ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া গিয়াছে, জাগাইয়া তুলে কার সাধ্য ! কিন্তু আজ সে ঘরের দাওয়ার খুঁটাটায় হেলান দিয়া পৈঠের ধারে পা ঝোলাইয়া, চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাঙ্গা মেঘের কোলে চাঁদ উঠিয়াছে, আর সেই চাদের দিকে চাহিয়া তাহার অনিমেষ আঁখি দুটি যেন কোন্ দূরান্তরের পানে কিসের সন্ধানে উধাও হইয়া গিয়াছে, [illegible] কি সুন্দর চাওয়া তার ! চাঁদও যেন তার সুডৌল সুন্দর মুখখানির দিকে অনিমেষে চাহিয়াছিল ! বিকচোন্মুখ চঞ্চলার পানে চাহিয়া সৃষ্টিধরের সমস্ত হৃদয় যেন মুহূর্ত্তমধ্যে নূতন সৌন্দর্য্য-রসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ভাবিল এই ত তাহার লক্ষ্মী ! এই ত তাহার গৃহের আনন্দ-প্রতিমা ! আর তাহাকে

চেষ্টা করিয়া মানুষ করিতে হইবে না! সে-ই এখন তাহার সংসারের সমস্ত ভার লইয়া তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে,—একটু সুখের মুখ দেখাইবে। সদ্যোভাবোচ্ছ্বাসিত হৃদয়টি লইয়া—কাছে আসিয়া চঞ্চলার পাশটীতে বসিয়া ডাকিল চঞ্চলা!—চঞ্চলা সৃষ্টির পানে চাহিয়া উঠিয়া যাইতেছিল। সৃষ্টি অঞ্চলটা ধরিয়া কহিল, থাক আমি এখন ভাত খেতে যাবো না। দাঁড়াও না, দুদণ্ড বসে কথা কহা যাক!

এই কয়টি দিনমাত্র চাষের সময় বলিয়া ও পাঁচজনকার অনুরোধে—ধিক্কারে স্বামীর জন্য চঞ্চলা রাঁধিতেছিল। ভক্ত স্বামীটিরও এই কারণে স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধার সীমা নাই। সে যে কি কহিয়া স্ত্রীকে তাহার ভালবাসা জ্ঞাপন করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাই মুখে যা আসিল, তাই আবেগভরে বলিয়া গেল। চঞ্চলা কোন উত্তর না দিয়া মুখটা ফিরাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সৃষ্টি ভাবের প্রাবল্যে চঞ্চলার হাতটি চাপিয়া কহিল,—আচ্ছা চঞ্চল! তুই কি আমায় ভালবাসিস্ না? না, বুড়ো বলে আমাকে পছন্দ হয় না? চঞ্চলা হাতটী ছাড়াইয়া লইয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল।

সৃষ্টি পুনরায় চঞ্চলার হাতটি চাপিয়া কহিল,—তুই ভালবাসিস না বাসিস্, তবু চঞ্চল তোকে আমি ভালবাসি! তোকে ভালবাসে যে আমার কত সুখ, তা কি ক'রে বলবো! বুড়ো হয়ে গিয়েছি বটে, তবু প্রাণটা তাজা আছে, জীবনে আর কখন ত কারো পানে চাই নাই। চঞ্চলা কোন কথা না বলিয়া সৃষ্টির

হাতটা ছাড়াইয়া, অশ্রুটা সম্বরণ করিয়া লইতেই যেন ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

সৃষ্টিও ভাবিল, তবে কি চঞ্চলার মনে কোন কষ্ট দিলাম? ভাবিয়া দেখিল,—অন্যায় ত কিছু বলে নাই,—যা সত্য, যা বলা উচিত, তাই বলিয়াছি, তবু আশঙ্কায় তাহাকে একেবারে ঘরের মধ্যে আসিতে হইল।

আসিয়া দেখিল, চঞ্চলা তাহারই জন্য ভাত বাড়িতেছে! চক্ষের কোণে অশ্রুটা শুকাইয়া গিয়া সেটা একটা স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টি অকারণে খানিকটা হাসিয়া কহিল, চঞ্চল! তুই এখানে ভাত বাড়ছিস্, আমি ভাবলুম বুঝি কাঁদ-ছিস্! কিন্তু সত্যাই, অন্যায় কখন তোকে বলি নাই। অন্যায় কখন বলবোও না। আমাকে তুই ভালবাস্‌বি ত?

'ঢং দেখে আর বাঁচি না' বলিয়া, একটা বক্র কটাক্ষের সহিত চঞ্চলা ভাতে পাথরটা সৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া পানের ডাবোরটা লইয়া বাহিরে গিয়া পান সাজিতে লাগিল।

সৃষ্টি কহিল,—তোর খাওয়া হয়েছে ত চঞ্চল?

চঞ্চল কহিল, হাঁ।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সৃষ্টি অনেক কথাই চঞ্চলাকে নিবেদন করিল। চঞ্চলা তার একটা কথার উত্তর দিল না। এই প্রৌঢ় যে কি কারণে এই বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিল, এই দুঃখে তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া ছিল। পাশ ফিরাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল।

(৩)

সকাল বেলায় জাগিয়া উঠিয়া চঞ্চলা দেখিল পৃথিবী পরিপূর্ণতায় ভরিয়া রহিয়াছে, শুধু তাহারই কি যেন নাই। সে-ই যেন রিক্ত! আপনার দিকে চাহিয়া, তাহার ভিতরটা যেন গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল; তাহার মনে হইল, তাহার মধ্যে যে অমৃত সরোবরটা ছিল, সেটা যেন কে সেচিয়া শুকাইয়া দিয়াছে, সে দিন আর চঞ্চলার গৃহস্থালীর কায-কর্ম্মে মন লাগিল না; গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া বিছানাতেই পড়িয়া রহিল। অনেক বেলার পর সৃষ্টি মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, কি রে চঞ্চল, এখনও যে শুয়ে রয়েছিস্। রাঁধিস্নি? অসুখ করেছে?

চঞ্চলা কহিল, হাঁ।

সৃষ্টি নিজেই স্নান করিয়া রান্না চড়াইয়া ছিল। তখন চঞ্চলা আস্তে আস্তে বিছানা হইতে উঠিয়া কুমারীশদের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। তাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া কুমারীশের মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা খুড়ী-মা, কুমারীশ ঠাকুরপো ইস্কুলে গেছে?

যদিও কুমারীশ ও সে ভিন্ন-জাতি, তবু গ্রাম-সম্পর্কে একটা সম্পর্ক পাতান ছিল; কায়স্থ ও কৈবর্ত্ত বলিয়া আকাশ-পাতালের ভেদ ছিল না। কুমারীশের মা কহিল, হাঁ ইস্কুলে গেছে।

চঞ্চলা কহিল, আমি মাসীমাকে একখানা চিঠি দিয়েছি, ডাকে গেল কি না, তাই জান্তে এলাম।

কুমারীশের মা কহিল, ডাকে যখন দিয়েছ মা তখন যাবে বৈ কি, বসো।

চঞ্চলা ঘরের দাওয়াটায় বসিয়া পড়িয়া কহিল,—আমার আর মা এখানে মন টিক্‌ছে না! মাসীমার ঘরে যেতে বড্ড ইচ্ছা হচ্চে।

কুমারীশের মা কহিল,—তা ইচ্ছে হয় বৈকি মা, কতদিন এসেছ। এখন তা যাবে—

এমন সময় কুমারীশের এক বিধবা দিদি আসিয়া কহিল—কি কৈবর্ত্ত বউ! এত বেলা হ'য়েছে, সৃষ্টির জন্য রাঁধিস্‌ নাই?

চঞ্চলা কহিল,—পারি না দিদি। রোজই কি ওমনি রাঁধা যায়?

বিধবা কহিল,—তা আর যায় না? স্বামীর জন্যে রাঁধতে আবার কষ্ট অছে বুঝি?

চঞ্চলা কথায় কোন উত্তর দিল না।—বিধবা হাসিয়া কহিল, —সৃষ্টিধর একটু বয়সওয়ালা বলে বুঝি তোর পছন্দ হয় না, না? তা হাঁরে পাগলী, স্বামী আবার বুড়ো—অবুড়ো আছে?

চঞ্চলা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তা যাই বলো দিদি, আমার কিন্তু এখানে পোষায় না। সেই যে রোজ দুবেলা রাঁধো বাড়ো—খাও থোও—সে আমি পেরে উঠি না!

বিধবা অমলা কহিল,—তবে তুই কেবল সুখ চাস্‌, না? বেশ বড়লোকের ঘরে খাটুতে খুটতে হবে না—বসে বসে খাবি কেমন?

চঞ্চলা সস্মিতমুখে কহিল—হ্যাঁ—

অমলা হাসিয়া কহিল,—দূঃ, ওকথা ব'ল্‌তে নাই। ভগবান তোকে যে ধনের অধিকারী করেছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকিস্‌। দেখবি তাতেই সুখ পাবি। বড়লোকের ঘরে—শুধু টাকার গদির ওপরে বসেই কি সুখ আছে রে পাগলী!—কত সোণার ঘরে সোণার প্রতিমা বউ যে, স্বামীর ভালবাসা পাওয়া দূরের কথা, একবার চোখের দেখাও পায় না। তোকে ত সৃষ্টিদা ভালবাসে! —কাঙ্গালের তাই ত সোণা রে—বলিয়া চঞ্চলার বাল্যকালে সৃষ্টিধর তাহার জন্য কত কি করিয়াছিল—এক একটী করিয়া তাহাকে সমস্ত শুনাইয়া গেল! কবে কোনদিন সে কাহারও বাড়ীতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সৃষ্টি বুকে করিয়া তুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছে; কবে পড়সীদের বাড়ী নারিকেল তেল পাঠাইয়া, দড়ি কাঁধা, চিরুণী দিয়া তাহার মাথাটি বাঁধিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছে, অমলা সকলই কহিয়া গেল। চঞ্চলাও ভাবিয়া দেখিল!— ভালবাসা সে পাইয়াছে বটে, সত্যই ভালবাসা পাইয়াছে, কিন্তু এমন বৃদ্ধের কাছ হইতে কেন? যমে যাহার মরণের ডাক পাঠাইয়াছে, বার্দ্ধক্য যাহার জীবনের নবীনতার উপর শুভ্রতার ছাপ ফেলিয়াছে, সেখানে হয় ত ভালবাসা আছে সত্য,—কিন্তু প্রতিদান দিয়া তৃপ্তি লাভ করিবার একটা অবসর কোথায়? মধ্যে যে একটা পর্ব্বত ব্যবধান করিয়া আছে! পদে পদে মৃত্যু গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তবে অগ্রসর হইতে হইবে! নবীন জীবনে এতটা কি পোষায়! আপন মনেই একটা ভাঙ্গা নারিকেলের মাথাকে ঠুকিয়া ঠুকিয়া মেঝের উপর বসাইতে লাগিল—এমন সময় জুতা পায় দিয়া

কুমারীশ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। চঞ্চলা কুমারীশের পানে চাহিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, কি ঠাকুরপো, এলে ইস্কুল হতে? আমার চিঠিখানা ডাকে দিয়েছিলে ত?

কুমারীশ কহিল,—হঁা দিয়ে দিয়েছি।

চঞ্চলা খানিক সেখানে বসিয়া থাকিয়া, পুনরায় আপনার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ী আসিয়া দেখিল, স্বামী সৃষ্টিধর রান্না-বান্না সমাপন করিয়া নিজে খাইয়া চঞ্চলার জন্য খাবার বাড়িয়া ঢাকা দিয়া, বাসন কয়টা ধুইবার যোগাড় করিতেছে!

চঞ্চলা কহিল,—থাক্ বাসনটা না হয় আমিই ধুয়ে ফেল্‌ব!

সৃষ্টি কহিল—"বেশ, দয়া হয়েছে নিদয়ার, এই আমার ভাগ্যি" বলিয়া হাসিয়া তামাকটুকু সাজিয়া টানিতে টানিতে মাঠে চলিয়া গেল। চঞ্চলা বাসন কয়টা মাজিতে মাজিতে মনে মনে ঠিক দিতে লাগিল—বুড়ার কাছ হইতে কি আদায় করা যায়? সন্তানের জননী হওয়া সম্বন্ধে সে হতাশই হইয়াছিল! ঠিক করিল, তাহাকে গহনার জন্য ধরিব! সেই গহনা কটিই মাত্র তাহার জীবনের গর্ব্ব হইয়া রহিবে। লোকের কাছে বলিতে পারিবে তাহার স্বামী তাহাকে আর কিছু দিতে পারুক না পারুক, এই গহনাই দিয়াছে। স্থির করিল, বুড়া যখন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া একটু আরামে শুইয়া বিশ্রাম করিবে, তখনই ধরিয়া কথা পাড়িবে। চঞ্চলার অনুরোধ সে এড়াইতে পারিবে না। সে যে তাহাকে ভালবসে,—প্রাণ দিয়াই ভালবাসে! কথাটা

চঞ্চলাকে পাড়িতে হইল না। সৃষ্টিধরই একদিন ভাত খাইতে খাইতে চঞ্চলাকে বলিয়া উঠিল, একটা জিনিষ নিবি, চঞ্চলা?

প্রথমটা চঞ্চলা ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল। তারপর যখন শুনিল, সে জিনিষটা সোণার, আর তার খুব আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী তাগা অনন্ত, তখন একবার সৃষ্টির পানে কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, যদি দাও, খুব ভালবাস্‌বো সত্যি বল্‌ছি—খুব ভাল-বাস্‌বো!

সৃষ্টিধরও আর একবার কথাটি স্বীকার করাইয়া লইয়া কহিল, তাহলে দ্যাখ ভালবাস্‌বি ত?—না আমায় আনাড়ী বুঝে দম্ দিয়ে ভুলিয়ে রাখবি?

চঞ্চলা ভঙ্গীর সহিত একটু চাহনি হানিয়া মুখটা ফিরাইয়া কহিল, না আমি নিশ্চয় ভালবাস্‌বো,—সত্যি ভালবাস্‌বো আমায় দাও!

সৃষ্টি কহিল, তবে দাঁড়া। দুদিন আমায় কিন্তু ছুটি দিতে হবে। আমার মামার গাঁয়ে বিক্রি আছে কিনা, আমায় নিজে যেয়ে আন্‌তে হবে। আমি চলে গেলে বাড়ীতে একা থাক্‌তে পার্ব্বি ত?

চঞ্চলা অধীর হইয়া কহিল,—সেজন্য তোমার কিছু ভাবনা নেই গো, তুমি আজই যাও না!

সৃষ্টি কহিল,—দাঁড়া, ধান টান দুটো বিক্রি করি—আমি গেলেই হলো,—টাকা চাই!

চঞ্চলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবেই তুমি এনেছ,—আর আমিও গহনা পরেছি !—

সৃষ্টি কহিল, আচ্ছা দেখিস। সত্যই একদিন মাসের শেষাশেষি সৃষ্টি সকাল বেলায় উঠিয়া মামার বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। চঞ্চলার মনটা সেদিন ভারি খুসী হইয়া উঠিল,—কল্পনায় পড়সী-দের ও মাসীমাকে নিমন্ত্রণ করিল। সন্ধ্যাবেলাতেই কুমারীশ তাহার ঘরের দুয়ার দিয়া যাইতেছিল ; চঞ্চলা তাহাকে ডাকিয়া কহিল ; একখানা পত্র লিখে দেবে ঠাকুর পো। মাসীমাকে পত্র দেবো।

কুমারীশ কহিল, সময় নাই। তারপর সৃষ্টির খবর লইয়া যখন শুনিল যে সৃষ্টি ঘরে নাই, তখন কি ভাবিয়া সম্মত হইল। কহিল, চলো যাওয়া যাক্ !

চঞ্চলা একখানা আসন পাতিয়া দিয়া, দোয়াত কলম ও কাগজ যোগাড় করিয়া দিয়া, কুমারীশের কাছটিতেই আসিয়া বসিল! কুমারীশ সাদা কাগজখানা ভাঁজ করিয়া কহিল, বলো কি লেখা যাবে।

চঞ্চলা কহিল, লেখ আমি ভাল আছি, আর মাসীমার অনেক-দিন কুশল সংবাদ পাই নাই। বাড়ীর কে কেমন আছে, অতি অবশ্য তার উত্তর দেয় যেন। আর মাসীমা, একবার এ বাটীতে আসিতে পারিলে ভাল হয়। তাগার কথাটাও মনে হইতেছিল এবং সেই কথাটা লেখাইবার জন্যই কুমারীশকে ডাকিয়াছিল,

কিন্তু সাহস করিয়া কথাটা কুমারীশকে খুলিয়া বলিতে পারিল না। কুমারীশ কহিল, আর কিছু লেখাবার নাই?

চঞ্চলা কহিল—না।

কুমারীশ পরিহাস করিয়া কহিল,—আচ্ছা আমি একটা কথা লিখে দিই—লিখি যে, তোমার স্বামী সৃষ্টিধর তোমায় খুব ভালবাসে।

চঞ্চলা লজ্জায় মুখটা ফিরাইয়া কহিল,—ত্যোৎ, ওসব কথা লিখতে আছে বুঝি?

কুমারীশ কহিল, কেন নাই?

কাথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে রাত অনেকটা হইয়া পড়িয়াছিল; তবু কুমারীশ আজ চলিয়া যাইতেছিল না—চঞ্চলাও আজ কুমারীশকে যাও বলিয়া উঠাইয়া দিতে পারিতেছিল না। যেন তাহার ক্ষুধিত প্রাণটা অনেক দিনের বুভুক্ষা মিটাইয়া লইবার অবসর পাইয়াছে; জোর করিয়া আপনাকে সে সুখাস্বাদন হইতে বঞ্চিত করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। সহসা বাহিরের দরজা খোলার শব্দ হইল! কুমারীশ চমকাইয়া কহিল, কে? চঞ্চলা বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল—সৃষ্টিধরই আসিতেছে। সৃষ্টিধর যখন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দুই জনেই চমকিত হইয়া উঠিল। দেখিলে বোধ হয়, যেন দুইজনকার মধ্যে একটা গোপন কিছু ছিল, হঠাৎ তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কাহাকে কিছু না বলিয়া কুমারীশ আস্তে আস্তে ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া গেল। একে সন্ধ্যারাত্রিতে কুমারীশ চঞ্চলার ঘরে একা দেখিয়াই

সৃষ্টির কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উপর তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে যাইতে দেখিয়া সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। চঞ্চলার পানে চাহিয়া কহিল, চঞ্চলা!

চঞ্চলা সৃষ্টির পা ধুইবার জল আনিয়া দিয়া কহিল, কি?

খুব একটা শক্ত কথাই সৃষ্টির ঠোঁটের আগে আসিয়াছিল; কিন্তু চঞ্চলার ঢল ঢল যৌবন-লীলায়িত মুখখানির দিকে চাহিয়া সে একেবারে ভুলিয়া গেল। তাহার সকল ক্রোধ, সকল সন্দেহ স্নেহে ও প্রেমে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল! গদ্গদ স্বরে কহিল, না চঞ্চলা, তোকে আমি কিছু বল্‌বো না—তুই সুখেই থাক্। তার পর কথাটা ফিরাইয়া কহিল, তোর কেমন অনন্ত এনেছি দেখ্‌বি? আয়, পরিয়ে দি! সযত্নে চাদরের খুঁট হইতে অনন্তটি বাহির করিয়া চঞ্চলার হাতে পরাইয়া দিয়া কহিল, কেমন মানিয়েছে বল্ দেখি! আবেগ ভরে তাহার রক্তাধরে একটা চুম্বন দিয়া কহিল—এইবার আমার ভালবাস্‌বি ত চঞ্চল! আমার যা সাধ্য ছিল তা ত শেষ করে তোর পায়ের তলায় ঢেলে দিলাম। এখন তোর মর্জ্জি, জানি তোর পাষাণ প্রাণ আমার উপর চির নির্দ্দয় চির বাম—তবু এই আমার এক মিথ্যা আকিঞ্চন—বলিয়া পাগ-লের মত আর একটা চুম্বন দিয়া কহিল হয়ত এই আমার শেষ চুম্বন! আর সহসা কেমন অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িল।

চঞ্চলা অপাঙ্গে একটু হাসিয়া কহিল আজকি তুমি মদ খেয়ে এসেছ নাকি বলিয়া স্বামীর জন্ত ভাত বাড়িতে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। অনন্ত পাইয়া তাহারও যেন হঠাৎ স্বামীর প্রতি কেমন

একটা ভক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—সযত্নে ভাত বাড়িয়া কহিল, এসো ভাত খাওসে।

সৃষ্টির কোন উত্তর আসিল না। চঞ্চলা কাছে গিয়া দেখিল, সৃষ্টি দাওয়াটায় উবুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, গোঁয়াইতেছে, চোখ মুখও লাল হইয়া উঠিয়াছে। চঞ্চলা আতঙ্কিত হইয়া ব্যস্ততার সহিত কহিল—কি হলো গো তোমার! দুই হাত দিয়া খুব জোরেই টানাটানি করিল। সৃষ্টি কষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—জোর ক'রে বুকের একটা ব্যথাকে চেপে রাখ্‌তে গিয়েছিলাম চঞ্চল! কিন্তু কেমন—বুক ভেঙ্গে গেল,—চেপে রাখ্‌তে পাল্লাম না তবু চঞ্চল! তোকে ছেড়ে যেতেও ইচ্ছা নাই! এখনও ইচ্ছা হচ্চে, আমার এই ভাঙ্গা বুকের রক্ত দিয়েই তোর পা দুখানি রাঙিয়ে দিয়ে যাই। চঞ্চলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প'ড়সীরা ছুটিয়া আসিয়া কহিল, ব্যাপার কি? চঞ্চলা কাঁদিয়া কহিল,—তোমরা দেখ, কি হ'য়েছে জানি না। ভাত বাড়্‌তে ব'লে আর ভাত খেলে না।

ডাক্তার আসিয়া কহিল,—সন্ন্যাস রোগেই ধরিয়াছে। বাঁচিবার আশা নাই—শুনিয়া চঞ্চলা চক্ষে অন্ধকার দেখিল। ভাবিল, স্বামী চলিয়া গেলে তাহার থাকিবে কি? কে আর তাহার এতটা আব্দার সহিয়া তাহাকে এমনভাবে করুণা করিবে? ভবিষ্যৎ সংসারটার পানে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল; তাহার উপর সন্ধ্যাবেলাকার ব্যাপারটা মনে পড়িয়া বাণবিদ্ধা হরিণীর মত ছটফট

করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যেন, তাহার উপর অভিমান করিয়াই স্বামী চলিয়া যাইতেছে। সবলে দুই হস্তে সৃষ্টির পা দুটা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু-অবরুদ্ধ স্বরে কহিল,—ওগো আমি দোষী নয়, দোষী নয়! তুমি আমায় মন্দ ঠাউরে চলে যেয়ো না! আমায় ক্ষমা করো। হু হু করিয়া দুই চোখের জলে নারী অভিষিক্ত হইতে লাগিল। মরণোন্মুখ সৃষ্টি চঞ্চলার একখানি হস্ত আপনার বুকের উপর লইয়া ব্যাকুল ভাবে শেষ চাহনিটী চাহিতে চাহিতে নীরবে প্রাণত্যাগ করিল। মরণের পর তাহার চোখের কোণে লাগিয়াছিল—একবিন্দু মায়ার অশ্রু!

* * * *

সেই রাত্রেই প্রতিবেশীরা সৃষ্টির মৃতদেহ সৎকার করিতে শ্মশানে লইয়া গিয়াছে। নিশিশেষে আকাশের ম্লান অর্দ্ধচন্দ্র উদিত হইয়াছে, বাতাসও একটা হু হু করিয়া বেদনা ভরে উচ্ছ্বসিত হইয়া বহিতেছিল। একাকিনী চঞ্চলার কাছে শুইয়াছিল, প্রতিবেশিনী কানাইএর মা! মাত্র এই রাত্রিটির মত দয়া করিয়া সে আসিয়াছিল। সহসা একটা দুঃস্বপ্নে সে জাগিয়া উঠিয়া কানাইএর মা দেখিল, রান্নাঘরের কাছটাতে খুব আলো, যেন আগুন লাগিয়াছে! পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল চঞ্চলাও নাই। ছুটিয়া গিয়া দেখিল, আপনাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া সেই বস্ত্রে চঞ্চলা আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। কানাইএর মা চীৎকার করিয়া পড়শীদের ডাকিল এবং জল ঢালিয়া আগুন নিভাইয়া দিল; কিন্তু তবু

তাহাকে বাঁচান গেল না। একই চিতায় স্বামী ও স্ত্রী দুইএর দাহকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। যাহারা চঞ্চলাকে সবিশেষ জানিত, বা না জানিত, তাহারা সকলেই "নিদয়ার" এই অপূর্ব্ব আত্মাহুতিতে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহার কথাটা দেশের স্ত্রী মহলে আলোচনার বিষয় হইয়া রহিল।

শেষ বোঝা

(১)

কোন রকমে সাধুচরণ বন্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল যদি, কিন্তু রাক্ষসের মত নির্ম্মম রক্তমুখো মহাজনটার হাত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইল না। নিজের স্ত্রীপুত্রের জীবনকেও তুচ্ছ করিয়া যে বলদ দুইটাকে ঘরের চালের উপর তুলিয়া সে রক্ষা করিয়াছিল, কিছুই না পাইয়া অবশেষে নিমাই হালদার মহাশয়ের লোলুপ দৃষ্টি—সাধুচরণের ঐ বলদ দুইটির উপরে পতিত হইল। সাধু অনেক মিনতি করিল। অনেক কাকুতি জানাইল।—এবারকার চাষের সমস্ত ফসলই তাহাকে দিবে শপথ পর্য্যন্ত করিল। কিন্তু হালদার মহাশয়ের সঙ্কল্প তেমনি অটুট রহিল। কহিল, এই রকম করিয়া যদি সকলকেই করুণা করিতে থাকি তবে আমার ব্যবসা চলে কি করিয়া? সে হইবে না, হয় টাকা, নয় বলদ, দুইএর এক চাইই।—সাধুচরণ গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিতে বসিল। সাধু-জায়া ভাগ্যধরী কহিল "আমার রূপার পৈঁছা ত রহিয়াছে, সেইটেই না হয় সুদের দরুণ দিয়া দাও। তারপর বরো ধান্য হইলেই সব শোধ দিয়া দিবে।" সাধু তাহাই ঠিক বলিয়া, হালদার মহাশয়ের পায়ে হাতে পড়িয়া পৈঁছা জোড়াটা সুদের দরুণ দিয়া সময় চাহিল।

সাধুর নিজের জমি জমা কিছুই ছিল না। ভাগে চষিয়াই খাইত। অর্দ্ধেক ফশল জমির স্বামীকে দিয়া বাকি অর্দ্ধেক নিজের সন্তানদের ও অভ্যাগতদের ভরণ পোষণ চালাইয়া কোন গতিকে বৎসরটা কাটাইয়া দিত। দেনাদুনি না থাকিলে এক রকমে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যায়। কিন্তু দেনার দায়েই সংসারটা সে কিছুতেই বাগাইয়া উঠিতে পারিতেছে না! কি যে হালদার মহাশয়ের টাকার সুদ, এ নাগাইদ নাগাড় শুধিয়াই আসিতেছে তবু শোধ আর হইতেছে না, ঠিক দিয়া কত একশত হইয়া গিয়াছে, তবু এখনও হালদার মহাশয়ের হিসাবে একশতের জের বাকি। সাধু ইহার জন্য কতবার হালদার মহাশয়ের হাতে পায়ে ধরিয়াছে—কিন্তু তিনি বলিয়াছেন লোক ডাকিয়া লইয়া আইস, লোকে যদি আমার হিসাবে ভুল ধরিতে পারে আমি টাকা ছাড়িয়া দিব! নিরক্ষর সাধুচরণ অবশেষে হালদার মহাশয়ের নির্ম্মম কারুণ্যের উপরেই আপনাকে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছে, তিনি মারিলে মরিবে আর রাখিলে সে টিকিয়া যাইবে।

এত দুঃখ এত দুশ্চিন্তা, তবু তাহার সংসারে আনন্দের ও হাসির অভাব ছিল না। প্রভাতের সূর্য্যালোক জগতে আসিবার পূর্ব্বে যে হাস্যধারা তাহার গৃহে জাগিয়া উঠে, নিশীথের চন্দ্রালোকে আকাশ প্লাবিয়া আসিলে সেই হাস্যধারা তাহার বক্ষের উপর ঘুমাইয়া পড়ে। দুইটি শিশু পুত্র, ও একটি কন্যা তাহার বুকজোড়া হইয়া ছিল। সাধু তাহাদের দিকে চাহিত আর আপনার সমস্ত দুঃখ সমস্ত দৈন্য ভুলিয়া যাইত। আবার পত্নীটিও

তাহার এমন ছিল যে সংসারের তেল নুন তরী তরকারীর ভার যাহা-কিছু নিজেই সে ধান ভানিয়া চাল কুটিয়া চালাইত, সাধু-চরণকে এবিষয়ে কিছু ভাবিতে দিত না—তাহার দুটী ধান জোগাড় করিয়া দিতে পারিলেই হইত। এমন সময় বোরোয় জল লাগিয়া গেল। সাধু মনে করিল, বোরোতে নিশ্চয় কিছু সে পাইবে। কিন্তু ভগবানের কি যে খেলা—পাকিবার মুখে এক পশলা বৃষ্টির অভাবে, সব বোরোই প্রায় মরিয়া গেল। অতি কষ্টে বিল হইতে ছেঁচিয়া যে দুই এক বিঘা বাঁচিল, তাহাতে চাষের খরচ উঠিবে কিনা সন্দেহ।—সাধু সমস্যায় পড়িয়া গেল। পত্নীর রক্ত অধরটিতেও যে একটা দুশ্চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাও সে দেখিল। তবু সাহস করিয়া একটা সান্ত্বনার কথাও বলিতে পারিল না। কি বলিবে? ভগবান যে মরার উপর খাঁড়া তুলিয়াছেন। গরিবের বক্ষ-রক্তটার পানে তাঁহারও যে একটা লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বক্ষে উঠিয়া বক্ষেই মিলাইয়া গেল।

এমনি সময়ে আবার জমিদারের বাড়ীতে বেগারের ডাক পড়িল। তাঁহার সুধা-ধবলিত হর্ম্ম্যে নব বৎসরের প্রারম্ভে কলি ফিরাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। তাহাতে গ্রামের সকল সাধু-চরণকেই চাই। অথচ এদিকে সাধুচরণের বানে-ভাঙ্গা ঘর যেমন হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া ছিল তেমনিই পড়িয়া আছে;—পয়সা নাই, কড়ি নাই, গতরও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া সাধু মনে করিল নমঃশূদ্রের ছেলে সে, না হয় জন মজুর

খাটিয়াই খাইবে। কিন্তু চারিদিকে জলের অভাবে জন মজুরও লোকে লইতে চাহে না। অবশেষে একদিন গ্রামের আমীন মণ্ডলের কাছে শুনিল, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী রেলোয়ে গুদামে মাল উঠা-নামার কার্য্যে বিস্তর কুলীর প্রয়োজন আছে, একটাকা করিয়া রোজ দিতেছে, যাইলেই কার্য্য হইবে। সাধুচরণ আর কালবিলম্ব না করিয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল! জ্যেষ্ঠ পুত্রটির হাতে বলদ দুইটির ভার দিয়া কনিষ্ঠ পুত্রটিকে ও কন্যাটিকে তাহাদের মায়ের বাধ্য থাকিতে বলিয়া, দুর্গা দুর্গা বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ভাগ্যধরী উপার্জ্জনের নাম শুনিয়া এতদিন, কিছু বলে নাই, কিন্তু স্বামীকে বিদায় দিবার সময় তাহার বুক ফাটিয়া চোখে জল আসিতে লাগিল।—এতদিন একসঙ্গে কাটিয়াছে, একটি দিনের তরে কেহ কাহারও বিরহ সহ্য করে নাই। চক্ষের জল আর রোধ মানিল না। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া হৃদয়ভার একটু লঘু করিয়া কহিল, যেখানেই থাকো, কেমন থাকো—রোজ একখানা করে যেন পত্র দিও। সাধুচরণ তাহাই দিব বলিয়া চলিয়া গেল। সাধুচরণেরও এই প্রথম বিরহ!

রেল গাড়ীতে উঠিয়া মনে হইল যেন কলের গাড়ী তাহাকে লইয়া কোন এক কলের জগতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। স্ত্রীপুত্রের জগৎ সেখান হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।—সাধুচরণের ইচ্ছা করিতে লাগিল গাড়ীর চালককে ডাকিয়া বলে ওগো গাড়ী থামাও—গাড়ী থামাও। ভাঙ্গা ঘরে অনাহারে

স্ত্রীপুত্রদের বক্ষে লইয়া জড়াজড়ি হইয়া মরিবে সেও ভাল, তবু সে বিদেশে যাইবে না! কিন্তু মনের জগৎ আর সত্য জগৎ এক নহে। তাহাকে মাল গুদামে উপস্থিত হইতে হইল, এবং বড় বড় গাঁটগুলা বহিতেও হইল! একমাস কাটিয়া গিয়াছে, স্ত্রী বার বার করিয়া মিনতি জানাইয়া লিখিয়াছে আর টাকার প্রয়োজন নাই তুমি বাড়ী চলিয়া আইস! সাধু তাহাই ঠিক করিয়াছে, বাড়ী যাইবে। গাঁট বস্তা বহাও তাহার দ্বারা ভাল হইয়া উঠে না। সে অসুরের বল তাহার আর নাই। সর্দ্দারের কাছে টাকা চাহিতে গেল। সর্দ্দার কহিল,—মাসটা কাবার করিয়া দিয়া টাকা লইয়া যাও। মাস কাবার হইতেও বেশী বিলম্ব ছিল না। সাধু কি করিবে অগত্যা তাহাতেই রাজী হইল—ভাবিল কি জানি সহায়সম্বলহীন সে, যদি মাসের খাটুনিটাই উড়াইয়া দেয়—কিছুই ত তাহার করিবার উপায় নাই! নইলে একদণ্ড তাহার এখানে তিষ্ঠাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। মাথা ধরিলে একটা আহা বলিবার কেহ নাই। রোগে পড়িলে একটু জল দিবার কেহ নাই। আর তাহা না হইলেও স্ত্রীপুত্রকন্যার বিরহ তাহার সহ্য হইতেছিল না। মনটা সদাসর্ব্বদা তাহাদেরই দিকে পড়িয়া ছিল। রাত্রিতে যে চিন্তা লইয়া ছিন্ন শয্যায় ঘুমাইয়া পড়ে, প্রভাতে সেই চিন্তা লইয়াই জাগিয়া উঠে। আবার দ্বিপ্রহরে যখন সমস্ত পৃথিবী রৌদ্রকিরণে স্তব্ধ হইয়া রহে, তখন লোহায় গড়া গাড়ীর ছায়ায় বসিয়া সেই চিন্তাই স্ফুটতর হইয়া চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। সাধু স্পষ্ট দেখিতে পায়, ভাগ্যধরী, পুত্রদের অন্ন পরিবেশন

করিতেছে ; আর পুত্রেরা তাহাদের মায়ের দিকে চাহিয়া মায়ের অগাধ স্নেহের সঙ্গে সুধা খাইয়া হাসিতেছে ।

ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃদয়টি অশ্রুতে ভরিয়া উঠে ; শূন্যে দুই অধীর হস্ত বিস্তার করিয়া বলে, ভগবান্ মিলাও, মিলাও !—নয় এ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দাও । এমন সময়ে ভগবান্ যেন তাহার কথা শুনিলেন ।

সেদিন সকাল হইতেই মেঘ করিয়া আসিয়াছিল । গুদামের বড় সাহেবর হুকুম হইল, বৃষ্টি আসিবার পূর্ব্বে বাহিরের সকল মাল, গুদামজাত হওয়া চাই । সাহেবের কড়া হুকুম । সর্দ্দার তাহার অধীন সকল কুলীকেই প্রাণপণে কাজে লাগিয়া যাইতে বলিল । সাধুও দয়ালের নাম লইয়া কাজে লাগিয়া গেল । বেলা দশটা পর্য্যন্ত খাটিয়া বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িল । আর তাহার সাধ্যে কুলাইতেছিল না । পাশ কাটিয়া বাহিরে বাহিরে দাঁড়াইতেছিল । সর্দ্দার তাহার ফাঁকি ধরিয়া ফেলিয়া কাছে আসিয়া কাহিল—সাধু, নাও দেখি এই গোঁটা দুই গাঁট আছে, ঘাড়ে করিয়া গুদামে দিয়ে এস । সাধু একবার ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, এতটা ভারি গাঁট পারিব ?

সর্দ্দার কহিল, সকলেই পারিতেছে, তুমি পারিবে না তার মানে কি ?

সাধু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাঁটটি ঘারে তুলিয়া লইল । মনে মনে কহিল, ঠাকুর নাও, এ ভার ঘুচিয়ে দাও, আর বইতে পারছি না প্রভু ! নীচু হইতে উপরটায় যেখানে মাল গুদামজাত করিতে

হয়, সে জায়গাটি অনেক ঢালু। সহসা পা পিছলাইয়া সাধু এমন ভাবে পড়িয়া গেল যে, মাথার গাঁটটার চাপে আর তাহাকে উঠিতে হইল না। এক মুহূর্ত্তে দম বন্ধ হইয়া প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল!

সকলে "কি হইল, কি হইল" বলিয়া ছুটিয়া আসিল কিন্তু সাধুচরণ আর কথাই কহিল না। ভাঙ্গা নাও শেষ বোঝা বহিতে বহিতে দরিয়াতেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। লাস যখন পুলিসের হেপাজতে আসিল, তখন কোমরে জড়ান কাপড়ের মধ্য হইতে দুই খানি পত্র বাহির হইয়া পড়িল—প্রথমখানায় পোষ্টাপিসের ছাপ মারা, সম্ভবতঃ দেশ হইতে আসিয়া থাকিবে। দ্বিতীয় খানা সদা লেখা, এখনও ডাকে পাঠান হয় নাই। সাধু স্ত্রীকে লিখিয়াছে; মহাজনের দেনা শুধিতে যাইতেছি, ভাবিও না। পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর দয়াপরবশ হইয়া চিঠিখানি আর ডাকে পাঠাইলেন না। সর্দ্দারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এর কিছু বাকী বকেয়া আছে?

সর্দ্দার অম্লান বদনে কহিল, না!

লাস জ্বালাইতে হুকুম হইল। তখন ভাগ্যধরী স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় ব্যস্ত হইয়া ঘর বাহির করিতেছে।

———

দত্তাপহারক

(১)

সকলেই জানিত বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় একটি কন্যার দায়েই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন; এবং এখন নিশ্চিন্তে গীতা ভাগবত লইয়া কাল কাটাইতেছেন, তবে একটা সান্ত্বনার বিষয় ছিল, কন্যার শ্বশুড় বড় লোক; সময়ে অসময়ে একবার জোর করিয়া চাহিতে পারিলেই দু পাঁচ শ মিলিয়া যাইবে। টাকাটা একেবারে না হউক, অন্ততঃ ধার স্বরূপেও মিলিতে পারিবে। কল্পনায় একটি আশার জগত গড়িয়া বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় প্রায়ই স্ত্রীর হাত হইতে এইরূপ বিনা বাধায় বিনা সঙ্কোচে অব্যাহতি লাভ করিতেন। দুই একজন অন্তরঙ্গ পাওনাদার দিগকেও এই আশ্বাসে আশ্বাসিত হইতে বলিতেন।—যদি কেহ নিতান্ত চাপিয়া ধরিত, তবে বলিতেন, দেখ ত এই মাঘ মাসেই সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে তাঁহার স্বাস্থ্যটিরও নিতান্ত ব্যতিক্রম সম্বন্ধে দু কথা না বলিয়া ছাড়িতেন না। কবে কোন দিন অম্বল হইয়া মাথা ধরিয়াছিল, কোন্ দিন রাত্রে সোডা না খাইয়া পেট ফাঁপিয়াছিল, এ সম্বন্ধে ও দু এক কথা বলিয়া তাঁহাদিগের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা পাইতেন।

মোটের উপর লোকটি যেমন সরলপ্রাণ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন

কাজকর্ম্মে তেমনি বেহুস ও বে-হিসেবি ছিলেন। সংসারটা যে কি জিনিস, সেখানে কি হিসাবে চলিতে হয় সে সম্বন্ধে কদাচিত চিন্তা করিয়াছেন কি না সন্দেহ। কেহ চাহিলে হয় ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখনও, তাঁহার যতদূর সাধ্যে কুলায়, প্রার্থিতের আংশিক অভাব পূরণ করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। কিন্তু নিজের স্ত্রীপুত্রদের জন্য কি করিয়া যাইতেছেন এ সম্বন্ধে কোন হিতৈষী আত্মীয় কোন সৎপরামর্শ দিতে আসিলে কথাটাকে কিছুতে ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। সংসারের নামেই যেন তাঁহার চিত্তটা কেমন বিমুখ ও কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আসিত অথচ এ দিকে দেনার সুদ ও জমিজমা ছাপাইয়া পৈতৃক বাস্তটিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিশেষ খবর জানিয়াও সে বিষয়ে তাঁহার প্রতিকার করিবার কোন চেষ্টাচরিত্র ছিল না। ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কেহ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলে বলিতেন, "জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি।" আপনার দিক হইতেও বোধ করি বৃদ্ধের ঐ কথাটিই পরম অবলম্বন ছিল; এবং এই ভরসাটুকু লইয়া ও শাস্ত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে মগ্ন থাকিয়া সকল দুশ্চিন্তা—সকল দুর্ভাবনার মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে দিন অতিবাহিত করিতে ছিলেন। সেদিনও তেমনি ভাবে গ্রন্থের মধ্যে ডুবিয়া ছিলেন। রাস্তার উপর ছেলেগুলা উন্মত্ত কলহাস্য করিয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। অপরাহ্ণের শেষ রবিরশ্মি, ক্লান্তভাবে ঘরের জানালা দিয়া তাঁহার অর্দ্ধছিন্ন কম্বলের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল; বৃদ্ধের কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না, আপন মনে পরারিস্তার

আলোচনায় বিভোর হইয়া ছিলেন। এমন সময় আদালতের একজন পেয়াদা, অত্যন্ত ভদ্রতা করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পদধূলি লইয়া, একখানা শমন তাঁহার হাতে দিয়া গেল। শমন দেখিয়াই মুখোপাধ্যায় শিহরিয়া উঠিলেন, পড়িয়া একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন তাঁহারই একজন অনুগত বন্ধু হরিচরণ তাঁহাকে কিছু না জানাইয়া একবারে আদালতে তাহার পাওনা টাকাটা আদায়ের জন্য আর্জ্জি রুজু করিয়াছে।

তত্ত্বশাস্ত্র হইতে প্রেম ও ভক্তি বলিয়া যে পদার্থটা সঙ্কলন করিতেছিলেন, সেটা এক মুহূর্ত্তে কোথায় যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া উড়িয়া গেল, তাহার আর কোন থেই রহিল না। ভাবিলেন তাই ত, কি করিতে হইবে, কি বলিতে হইবে, তাহা যে তাঁহার কিছুই জানা নাই, এতটা বয়স হইয়াছে বটে, কিন্তু আদালতে ত কখনও দাঁড়ান নাই। অত্যন্ত শঙ্কিতভাবে তিনি গৃহিণীর পরামর্শ লইতে গেলেন। গৃহিণী সমস্তটা শুনিয়া, মুখটা ভার করিয়া কহিলেন, "সুধু ধর্ম্ম নিয়েই আছ, জান না ত! বন্ধুই বল, আর ভাই-ই বল, সংসারে টাকাটাই বড়। যখন ধার করেছ, তখন শোধ দিতেই হবে।"

বীরেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন. "না. আমি তা ব'লছি না; ভাবছি আদালত যেতে হ'ল?"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "আদালতে যেতে হবে না? মনে নেই বন্ধকী খতে নাম লিখে এসেছিলে? এই রকম করেই সব নষ্ট করবে জানি ত"—বলিয়া, বীরেশ্বরের বিক্ষোভিত হৃদয়ভাবটিকে

আরও বিক্ষোভিত করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। বীরেশ্বর চিন্তিত-ভাবে সেই খানেই বসিয়া পড়িলেন। বাহিরের ঘরে যে গীতা ভাগবত পড়িয়া আছে তাহা তাঁহার মনেই রহিল না। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া আসিল। তখনও তাঁহার চেতনা নাই। সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ হয়, তখনও শমনখানি হাতে করিয়া ভাবিতে ছিলেন। শিশু পুত্রটি একবার তাহার পিতার কাছে আসিয়া, তারপর কোন রকম আমল না পাইয়া, চলিয়া গেল। বড় ছেলেটিও তাহার পিতার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিয়া প্রস্থান করিল।

গৃহিণী কাত্যায়নী আর থাকিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, যাই হোক এসময় একটু সান্ত্বনা দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। কাছে আসিয়া কহিলেন, "ভেবে আর কি হবে বল, যা হয় হবে, সন্ধ্যা-আহ্নিকটা ত সেরে নাও।"

বীরেশ্বর চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তাই ত, বল্‌তে হয়।" তাহার পর তন্ত্রশাস্ত্রের একটা শ্লোক আওড়াইয়া কহিলেন, "কেই বা কার, আর কারই বা টাকা। এই অর্থচিন্তার মোহে ঈশ্বরকেও ভুলতে বসেছি, গিন্নি দেখ, এই জন্তই ঈশ্বরপ্রেমিক যাঁরা, তাঁরা সংসার হ'তে দূরে গিয়েই ভগবদ্ আরাধনায় জীবন কাটিয়ে দেন।"

গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, "তুমিও তা'হলে দূর বনে যেও। কিন্তু ধার করেছ যা, তা ত আগে শোধ ক'রে দিয়ে যেতে হবে।"

বীরেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "অবশ্য।"

কাত্যায়নী কিন্তু দুই হাত নাড়িতে নাড়িতে বেশ একটুখানি বিদ্রূপের ভাবেই বলিয়া গেলেন, "বনেই যাও, আর পর্ব্বতেই যাও, শূন্যে হাতড়ে কিছুই মিলবে না, ঘরে স্ত্রীপুত্রের যখন দুঃখের অন্ত নাই।"

বীরেশ্বর অনেকবার স্ত্রীর এই বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, কাজেই তাহাতে তাঁহার প্রতিবাদ করিবার কিছুই ছিল না। তিনি ভাবিলেন, অর্ব্বাচীন এরা ভগবত্তত্ত্বের কি বুঝিবে!

(২)

"আজ মকর্দ্দমার দিন, কখন যাবে গো।" এই বলিয়া গৃহিণী বীরেশ্বরকে একবার জাগাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। বীরেশ্বর কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানিতে ছিলেন; আজ যে আদালতে কিছু একটা জবাব না দিলে পাওনাদার এক তরফা ডিক্রী করিয়া তাঁহার বিষয় ক্রোক করিয়া লইবে, সে বিষয়ে তাঁহার যেন কোন ভাবনাই নাই।

কাত্যায়নী স্নান সারিয়া আসিয়া দেখিলেন তখনও বৃদ্ধ তামাকই টানিতেছেন। ভারি রাগ হইল, কাছে গিয়া তীব্র ঝাঁঝের সুরে কহিলেন, "কি ভেবেছ বল দিকি, ছেলে দুটোকে পথে না বসালে বুঝি তোমার শান্তি নেই? জামাইবাড়ী যে যাবে ব'লেছিলে তারই বা কি করলে?"

বীরেশ্বর গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "আমার ভাবনা, আমি

ভেবে রেখেছি, তার জন্য তোমাদের অত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন ত দেখি না।"

কাত্যায়নী, পূর্ব্ববৎ হাত নাড়িয়া কহিলেন, "যা ভেবে রেখেছ, তা আমার খুব জানা আছে, ব'সে ব'সে যে সব উড়ুবে এ ত জানা কথা।" তাহার পর একটু নরম সুরে কহিলেন, "কি ভেবে রেখেছ আমায় বল্‌তে হবে।"

বীরেশ্বর তখন আপন কল্পনা-জগতের সমস্ত রহস্যময় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, সহধর্ম্মিনীকে তাহার মধ্যে লইয়া গেলেন, এবং সমস্তটি বুঝাইয়া কহিলেন, "আচ্ছা বল দিকি ঠিক মতলব বের করেচি কি না?"

কাত্যায়নী এতদিন যে স্বামীকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ভিন্ন আর কিছুই ভাবেন নাই, সেই স্বামীর এই কল্পনাচাতুর্য্যে বিস্মিত হইয়া গেলেন। প্রসন্ন মুখে ধীরে ধীরে কহিলেন, "যা যুক্তি ক'রেছ মন্দ নয়, কিন্তু বেঁধে আন্‌তে পার্‌লে হয়। যে রকম কুড়ে তুমি।"

বীরেশ্বর কহিলেন, "না না সে জন্য কিছু ভেব না। এতদিন শুধু বাড়ীতে ব'সে আছি ব'লে ভেবেছ, একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছি, বাস্তবিক তা নয়। এখনও এমন সামর্থ্য আছে বাড়ীতে ব'সেই মাসে পঞ্চাশ টাকা রোজগার কর্‌তে পারি।"

শেষ কথাটি খুব জোর দিয়াই তিনি বলিয়া গেলেন। অন্য সময় হইলে কাত্যায়নী এই কথায় রীতিমত একটা তীব্র উত্তর দিতে পারিতেন, কিন্তু এই সহাস-সঞ্জাত দাম্পত্য-প্রীতির উপর কোন প্রকার বিদারণ রেখা টানিয়া সেটাকে আরও জয়গ্রহ কর

অপেক্ষা এই নিতান্ত অসহ্য মিথ্যাটিও গলাধঃ করিয়া লওয়া শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "যাই হোক, তা হলে এখনই ত তোমায় জামাই বাড়ী যেতে হবে।"

বীরেশ্বর কহিলেন, "তা যাব বৈকি, টাকাগুলো ত আনতে হবে।" একটা অনিশ্চিত আশার উপর আপনার সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া বৃদ্ধ বীরেশ্বর দুরাঞ্চলে জামাইবাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। আদালতের রাস্তা অপেক্ষা এই রাস্তাটিই তাঁহার সোজা বোধ হইল।

অন্য অন্য বারের অপেক্ষা এবার হাতে কিছু অধিক মিষ্টান্ন লইয়া তিনি বেহাই-বাড়ী উপস্থিত হইলেন, তাঁহার কন্যার শিশু-পুত্রটি যে তাঁহাকে "দাদামশাই" বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে! বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই বৃদ্ধ, "দাদা কইগো!" বলিয়া ডাকিলেন। কান্ত ঝী বীরেশ্বরকে অন্দর ও বাহির মহল সংলগ্ন একটা ঘরে বসিবার আসন করিয়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া উমাকে ডাকিয়া দিল। উমা সপুত্র আসিয়া পিতার চরণে প্রণতা হইল। বৃদ্ধ কন্যার শিশুপুত্রটিকে বুকে করিয়া অনেকক্ষণ কথাই কহিতে পারিলেন না। যেন তাঁহার সংসারজ্বালা-পীড়িত হৃদয়টি এই শিশুর ছুটী কচি-বাহুর শীতল স্পর্শে একবারে জুড়াইয়া গেল। তারপর শিশুর মুখে অজস্র চুম্বন দিয়া কহিলেন, "দাদা আমি যে তোমায় নিতে এসেছি, যাবে না?"

কান্ত ঝীর বাড়ীর মধ্যে একটু বেশী প্রভাব, সে তখন সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, কহিল "আপনার যে মনে পড়েছে এই

ঢের," তারপর খোকাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "নীলমণিকে বুঝি এই দিলে নীলমণির ঠাকুর্দ্দা ?" এই বলিয়া সন্দেশের ঠোঙাটা হাতে তুলিয়া পরম হেনস্থা ভরে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া বাড়ীর জনে জনে বড় বৌএর পিতৃপ্রদত্ত উপহারের দীনতা দেখাইতে লাগিল। উমার শ্বাশুড়ী বড় গলা করিয়া কহিলেন "ছোটলোকেরা তত্ত্বতালাসের কি জানে ব'ল, সেই বিয়ে হ'তে এই পর্য্যন্ত ত দেখে আস্‌ছ, একবারে ডাহা ছোট লোক।"

কথাটা বীরেশ্বরের কান পর্য্যন্ত পৌছিল ; কিন্তু তিনি ইতি-পূর্ব্বে অনেকবার বেহাইজায়ার ওরকম মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত ছিলেন, কাজেই একথায় তাঁহার এতটুকু চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা গেল না। উমার কিন্তু ঘৃণায়, ক্ষোভে ও লজ্জায় অন্তরাত্মাটা জ্বলিয়া উঠিল। পিতার মুখের দিকে ছলছল দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "বাবা, কেন তুমি এ সব খাবার নিয়ে এস। আমি তোমায় এত করে বলে দি কিছু এনো না, তবু কেন আনো ; বড় লোকের বাড়ীর ধারা ত বরাবর দেখে আস্‌ছ, ওরা মনে করেন, কিছু দিতে থুতে না পার্‌লেই প্রাণের টান জানানো হয় না!"

বীরেশ্বর হাসিয়া কহিলেন, ওদের যেমন বুদ্ধি! তুইও যেমন মা, বল্লেই বা দুকথা, তোর ছেলে আমার যে কি জিনিষ তা ভগবান ছাড়া সে খবর আর কে জানবে বল ? উমা আচলে চোখ মুছিয়া কহিল, "না বাবা তুমি কিছু এনো না, এ আমি আবার বলে রাখ্‌ছি। আমি সব সইতে পারি, কিন্তু আমার সামনে

তোমার অপমান কিছুতে সইতে পারি না! বলিতে বলিতে তাহার চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বীরেশ্বর চাদরের খুট দিয়া কন্যার মুখখানি মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "দূর পাগলী! মেয়ের বাপকে জামাইয়ের মা-বাবা দু কথা বলেই থাকে.। তোদের মুখ তাকিয়ে এটা আমরা সইতে পারি, কোন কষ্ট হয় না।"

সারাদিন নাতিটিকে বুকে লইয়া কন্যার সহিত গল্প করিয়া একরকম কাটিয়া গেল। রাত্রে বেহাইয়ের কাছে কথাটা পাড়িবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বড় লোকের সঙ্গে সর্ব্বদাই এত মোসাহেবের ভিড় থাকে যে ভিড় ঠেলিয়া বেহাইকে একটু নির্জ্জনে পাওয়াই তাঁহার দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। জামাই বাড়ীতে নাই যে, জামাইকে নিয়াই কথাটা পাড়িবেন। সে দূরসহরে কলেজে পড়িতেছে, সপ্তাহান্তে বাড়ী আসিয়া থাকে। কাজেই বৃদ্ধকে একটু ভাবনায় পড়িতে হইল! এদিকে বাড়ী হইতে আসিবার সময় স্ত্রীকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, ঝড়ের মত পড়িয়া টাকাটা আদায় করিয়া লইয়া আসিবেন। এমন সময় একটু সুযোগও ঘটিয়া গেল। পরদিন তাঁহার বেহাই শারদশঙ্কর ভুঁড়ি দোলাইয়া মাছ ধরাইবার জন্য পুষ্করিণীর দিকে যাইতেছিলেন, মোসাহেবগণ কিম্বা বয়স্যগণ আগে হইতেই মৎস্যের যোগাড়ে গিয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া বীরেশ্বর কাছে আসিয়া কহিলেন, "বেহাই, আপনাকে একটা কথা বলব মনে করে এসেছিলাম কিন্তু সময় পাইনি।"

শারদাশঙ্কর, কহিলেন, "বলুন না কি কথা ?" তিনি বেহাই-য়ের মুখের ভাবটা দেখিয়া অনেকটা যেন আন্দাজ করিয়া লইয়াছিলেন। নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে বীরেশ্বর তখন এক মুহূর্ত্তে বেহাই-য়ের কাছে আপনার সমস্ত অবস্থার কথা জানাইয়া এবং দুটী হাজার টাকার অভাবে তাঁহার দশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি যে নীলামে উঠিয়াছে, এটা বার বার করিয়াই জানাইয়া গেলেন। তারপর তাহার জন্য যে তিনি তাঁহার কাছে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন, সেটাও জোড়হাত করিয়া কোনরকমে বলিয়া ফেলিলেন।

শারদাশঙ্করও গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "যখন দরকার পড়বে আসবেন, দুহাজার টাকা বৈ-ত নয় !"

বীরেশ্বর কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ মাসখানেকের মধ্যে পেলেই চল্‌বে। আপনাদের পূজা-পার্ব্বণে কত হাজার হাজার টাকা খরচ হয়ে যাচ্চে—গরীবের একটু উপকার করলে বড্ডই ভাল হয়, অবশ্য টাকাটা ধার স্বরূপই চাচ্চি।

শারদাশঙ্কর ভরসা দিয়া কহিলেন, আচ্ছা সে দেখা যাবে তখন।

সেদিন বেহাইকে খুব ঘটা করিয়া খাওয়ান হইল। তারপর রাত্রে শারদাশঙ্কর পত্নীকে কহিলেন, "দেখেছ লোকটার রকম, জামায়ের বাপের কাছে টাকাটা ধার চাইতে আসতেও একটু লজ্জাবোধ হল না।"

গৃহিনী কহিলেন, "দিও না, তা হলেই লেঠা চুকে যাবে।"

শারদাশঙ্কর কহিলেন, "তা আর বল্‌তে, তবে বলি কিনা লোকটা কি কম ছোট লোক, বিয়ের পর তত্ত্ব-তালাসের কথাগুলো ত আমার মনে আছে। ছ্যাঃ! মেয়ে ভাল খুঁজতে গিয়ে এমন ছোটলোকের সঙ্গেও কুটুম্বিতা করেছিলাম।"

এদিকে বীরেশ্বর নিশ্চিন্ত হইয়া দৌহিত্রের হস্তে রাস্তা খরচের জন্য যে দুইটি টাকা ছিল সে দুইটী পর্য্যন্ত নির্ব্বিকার ভাবে সন্দেশ খাইতে তুলিয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন।

বাড়ী আসিতেই কাত্যায়নী কহিলেন, সুখবর ত?

বীরেশ্বর কহিলেন, সুখবর আবার নয়, আমি তখনই বলেছিলাম চাইবামাত্র টাকাটা পাওয়া যাবে। তারপর অনেকখানি ভূমিকা ফাঁদিয়া কহিলেন, বেহাই ত হেসেই খুন। বল্লেন সামান্য দু এক হাজার টাকা বৈ না ত, যেদিন দরকার পড়বে এসে নিয়ে যাবেন। আমিও ভাবলাম টাকাটা এখন কোথায় রাখ্‌ব? আর তাদের গোমস্তার মুখে শুনলাম মহল হতে বেশী টাকাও আসে নি।" তারপর একটু থামিয়া গৃহিনীর দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া আবার কহিলেন, "আরও কিছু বেশীর আশা আছে কিনা? ছেলে দুটোর জন্যেও অমনি একটা গতি করে নিতে হবে!"

কাত্যায়নীও খুসী হইয়া কহিলেন, "তা বেশ, মেয়েকেও আনবার কথা অমনি বলে এসেছ ত? না টাকা টাকা করেই সব ভুলে গিয়েছিলে?

বীরেশ্বর বলিলেন, "পাগল! মেয়েকে আনবার কথা না বলে

কি থাকতে পারি! এই আসচে মাসেই উমাকে নিয়ে আসব। আহা উমার ছেলেটি যে হয়েছে যেন রাজপুত্তুর।"

বৃদ্ধের আজ কথা বলিয়াও আশ মিটিতেছিল না, শোনাইয়াও আশ মিটিতেছিল না। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল যেন সেই সব ঘরে ঘরে বলিয়া আসেন। যাহারা বলিয়াছিল গরীব হইয়া বড় লোকের ঘরে কুটুম্বিতা করিতে নাই, আজ তাহারা দেখিয়া যাউক শুধু দেখিয়া যাউক নহে—শুনিয়াও যাউক। হায় সরল বৃদ্ধ! জগতটি যে তোমার কাছে কত মায়াবী তাহাত অবগত নহ। কাত্যায়নীও কিন্তু বীরেশ্বরের কথা বিশ্বাস করিয়া গেলেন!

নির্দ্দিষ্ট দিনে বীরেশ্বর শারদাশঙ্করের কাছে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বেহাই টাকাটা এইবার দিয়ে দিন।

শারদাশঙ্কর যেন আকাশ হইতে পড়িলেন এইভাবে কহিলেন, "কিসের টাকা?"

বীরেশ্বর কহিলেন, "সে কি বেহাই আপনি যে আশা দিয়াছিলেন! মনে নেই?" পরে তারিখটা স্মরণ করাইয়া দিয়া কহিলেন ভাবুন দেখি!

শারদাশঙ্কর কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, "ওঃ, আমার ত মনেই ছিল না। টাকা যে সব কালেক্টরীর পৌষ কিস্তিতে চালান দিয়ে ফেলা গেছে, এখন ত কিছু নেই।"

বীরেশ্বর মহাব্যস্ত হইয়া কহিলেন, সে কি বেহাই, অন্ততঃ হাজার টাকাও যোগাড় করে দিতে হবে।"

শারদাশঙ্কর কহিলেন, "এখন ত এক পয়সাও দেবার উপায়

নেই, আমিই ধার করে পাঠিয়েছি,—আচ্ছা কবে চাই আপনারি বলুন দেখি ?"

বীরেশ্বর কহিলেন, "কাল, কাল না পেলে যে আমার সব সম্পত্তি একবারে হাত ছাড়া হয়ে যাবে ; মাথা রাখবার স্থানটুকুও যে থাকবে না।

শারদাশঙ্কর কহিলেন, "কি করব বলুন। উপায় ত নেই।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া পীড়াপিড়ি করিয়াও যখন কোন ফল দর্শিল না, তখন বীরেশ্বর ভাবিলেন, যাই আর কোথাও চেষ্ট দেখি। কিন্তু কন্যার সহিত দেখা না করিয়া কি করিয়া যাওয়া যায় ? নীলমণিকেই বা একবার বুকে না লইয়া কি করিয়া যাওয়া হয় ? যাউক ঘর নিলাম হইয়া! কম্পিত হৃদয়ে উমাকে একবার ডাকিয়া পাঠাইলেন। উমা আসিয়াই পিতার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, "বাবা এমন চেহারা হয়ে গেছে তোমার, একেবারে চেনবার যো নাই !"

বীরেশ্বর অতিকষ্টে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন, "মা, এখন মরলেই সব আপদ চুকে যায় ; আমার নীলমণি কোথায় ? তাকে এই টাকাটি সন্দেশ খেতে দিও। বলিয়া অতিকষ্টে চাদরের খুট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া ফেলিলেন।

উমা বাধা দিয়া কহিল, "না বাবা থাক্ ওকে টাকা দিতে হবে না, আমার ভাইদের বরং দিও।"

বীরেশ্বরের টাকা হাতেই রহিয়া গেল। তাঁহার নিকট তখন সমস্ত জগতটি যেন কেমন ছায়াময় বলিয়া ঠেকিতেছিল। সর্বাঙ্গ

বাইতে বসিয়াছে, আর তিনি এখনও নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন ! সহসা বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মা তবে চল্লাম, এসেছিলাম বটে একটা কাজের জন্য, তা ত হল না !" বৃদ্ধের বুক চিরিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

উমা কহিল, "বুঝি টাকার জন্যে এসেছিলে ?" উমা অগ্রে হইতে আপ্‌চা আপ্‌চা কতকটা শুনিয়াও ছিল।

বীরেশ্বর অতিকষ্টে উত্তর দিল, "হাঁ মা !"

উমা কহিল, 'বাবা কেন এসেছিলে ? এবাড়ীর এরা কি মানুষ ? এক একটা বাইনাচে এদের কত হাজার হাজার উড়ে যায়, তুমি চাইতে এলে দেবে কেন ! তুমি যে এদের বাড়ীর বৌয়ের বাপ !

বীরেশ্বর কহিলেন, "আশা দিয়েছিলেন বলেই এসেছিলাম, এখন বল্লেন কোথায় পাব,—টাকা নেই ! বড় মানুষের ধারা দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি মা। এখন এমন সময় নেই যে, অন্য কোথাও হাওলাত বরাত করব ! কাল না দিতে পারলে পরশু গাছতলায় দাঁড়াতে হবে। তবু আমায় একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে ; তা হলে চল্লাম মা !" উমা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সজলনেত্রে কহিল, "তা বাবা দুটী না খাইয়ে ত তোমায় কিছুতেই ছেড়ে দিতে পাচ্চিনা।

বীরেশ্বর কহিলেন, "আর মা খাওয়া, এইবার হয় ত ছাই খেতেই হবে। তোকে দু'এক দিনের জন্য যে ঘরে নিয়ে যাব, সে উপায়ও থাকবে না।"

উমা তবু পিতাকে ছুটী না খাওয়াইয়া ছাড়িল না ; কিন্তু বিদায় দিবার সময় পিতার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সেই স্নেহময় পিতার আজ এই দুর্দ্দাশা! যে পিতা একরকম তাহারই জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অকূলে ঝাঁপ দিয়াছেন ; যাহার সুখের জন্য—শান্তির জন্য নিজের শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত অকাতরে বিলাইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেই কন্যা আর পিতার এই দৈন্যম্লান মূর্ত্তির সম্মুখে সহজ নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া!—এই প্রাসাদতুল্য ভবন, ঐশ্বর্য্য, এমন কি গাত্রের অলঙ্কারগুলা পর্য্যন্ত যেন তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া হাসিতে লাগিল! উমা পিতাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহার গোপন পুঁজির যথাস্বর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত বাহির করিয়া আনিয়া পিতার হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "বাবা, যাই হোক সামান্য এ—তবু তোমায় নিতেই হবে, আর আজ যদি তিনি আসেন, কালই আমি তাঁকে আদালতে পাঠিয়ে দেব। তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। বলিতে বলিতে, তাহার দুই চক্ষু বহিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অশ্রু-অবরুদ্ধ স্বরে কহিল, "বাবা কেন স্বর্ব্বস্ব খুইয়ে মেয়ের সুখের জন্যে এ বড়-লোকের বাড়ী আসতে গিয়েছিলে? আমার মায়ের কথা, ভাই দুটির কথাও ভাবা উচিত ছিল।"

বীরেশ্বর নোট কয়খানি গণিয়া দেখিলেন, একশত দশ টাকা হইয়াছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নোট কয়খানি বুকের মধ্যে গুঁজিয়া কহিলেন, "মা, এ তোর না দিলেও চলতো।" কিন্তু সাহস করিয়া তিনি ফিরাইয়া দিতেও পারিলেন না। কি জানি

যদি কিছু উপায় হয়। আজ তাঁহার কোন জ্ঞানও ছিল না। কেবল ভাবিতেছিলেন টাকা! টাকা! কোথায় টাকা? কোথায় টাকা পাওয়া যায়!

৫

আদালতে উপস্থিত হইয়া পরিচিত উকীল মোক্তার প্রত্যেকের নিকট আপনার অবস্থাটার কথা নিবেদন করিলেন, কিন্তু কোন উকীল মোক্তারেরই দয়া হইল না। সকলেই কহিল, নীলাম হইবার পূর্ব্বে আসিলে লেখা-পড়া করিয়া টাকা দেওয়া যাইতে পারিত। তখন উপায়হীন অবস্থায় আদালতের আম গাছটির তলায় বসিয়া বীরেশ্বরের কি আক্ষেপই হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন তিনি বেহাইয়ের উপর ভরসা করিয়া কি নির্ব্বুদ্ধিতার কাজই করিয়াছেন। সামান্য টাকার জন্য সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়া যাইবে, অথচ তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না? তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, এইখানে যেন মাথা কুটিয়া মাটির সঙ্গে মাটী হইয়া মিশিয়া যান। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে দৈন্য-ক্লিষ্ট গৃহের সকরুণ ছবি জাগিয়া উঠিল। তিনি যেন স্পষ্ট দেখিলেন, পুত্র দুটির হাত ধরিয়া কাত্যায়নী আসিয়া এই গাছতলায় দাঁড়াইয়াছে; তাঁহার সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ যেন এক মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল! তিনি সেই খানেই চৈতন্য হারাইয়া ঢলিয়া পড়িলেন।

সমস্ত রাত্রি কি ভাবে কাটিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার

হুঁসই ছিল না। সকাল বেলায় জাগিয়া দেখিলেন, একটা ঘরের বিছানার উপর তিনি শুইয়া রহিয়াছেন। আর পার্শ্বে তাঁহার জামাই গৌরসুন্দর উপবিষ্ট। জামাইকে দেখিয়াই বৃদ্ধের যেন অনেকটা ঘোর কাটিয়া গেল।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিলেন। গৌরসুন্দর থামাইয়া তাহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিয়া কহিল, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনার বাড়ীঘর সমস্তই রক্ষা হয়েচে।"

বীরেশ্বর সবলে জামাইয়ের হাতটি চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন "বাবা তুমি! তুমিই কি হতভাগ্য শ্বশুরকে রক্ষা করলে?"

গৌরসুন্দর ধীরে ধীরে কহিল, "আজ্ঞে আমি ঠিক না। আপনার কন্যাই তাঁর সমস্ত অলঙ্কার দিয়ে—গৌরসুন্দর আর কিছু বলিতে পারিল না। বীরেশ্বরের মুখে গভীর কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে মুখ বিষাদের ছায়ান্ধকারে ম্লান হইয়া আসিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "মা আমার সব জিনিস ফিরিয়ে দিলে? তা দিক— আমি যে তার অক্ষম পিতা।—ওঃ—আমি দিয়েছিলাম, আবার আমিই সব কেড়ে নিলাম!" প্রভাতের সৌরকররাশি, অবসন্ন বৃদ্ধের শিয়রে দাঁড়াইয়া, যেন একটা উন্মাদ পুলকে হাসিয়া উঠিল।

———

একই সঙ্গে দুই এর মন যোগান অসম্ভব। চারিটা হাত, পা থাকিলে কথা থাকিত বটে,! মাসেক দুমাস কোন "উকো চাকা" নাই। হঠাৎ একদিন আষাঢ়ান্ত দিনের সন্ধ্যাবেলায়—মাঠ হইতে খাটিয়া খুটিয়া বাড়ী আসিয়া ভিখু শুনিল পূর্ণ মণ্ডল তাহার নামে নালিশ করিয়াছে, এবং আদালতের পেয়াদা আসিয়া ঢোল সহরৎ দিয়া ভিটে টুকু ক্রোক করিয়া গিয়াছে। স্ত্রীর কাছে সমস্তই শুনিল। ছোট ছেলেটিও তাহার বাবার কাছে আসিয়া কহিল, "হঁা বাবা নালিশই হয়েছে।"

ভিখু কহিল "কই দেখিদেখি কাগজখানা।"

স্ত্রী তুষ্টবতী, কাগজ খানা ভিখুর হাতে দিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, "একশো টাকার নালিশ, ভিটে টুকুও আর থাকে না!—"

ভিখু আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল,—"একশোটাকা? সে ত কথনোই নয় মোড়লের দশটাকার বেশী পাওনা হবে না।"— উত্তেজনায় কাগজখানা একবার খুলিয়া চাহিয়া দেখিল!—কিন্তু অন্ধের দিবারাত্র জ্ঞানের মত কাগজ খানা তাহার চক্ষে সমানই নির্বিকার। কয়েকটা কালো কালো রেখা ছাড়া আর কিছু তাহার নজরে ঠেকিল না। লেখাপড়া শিখিবার সে সুযোগটা জীবনে ত কখন ঘটে নাই। তুষ্টবতী কহিল "আমি ফকির পণ্ডিতের কাছে পড়িয়ে এসেছি, একশোটাকাই বটে।"

ভিখুর তৃষ্ণা কোথায় উড়িয়া গেল। তখনি সে মণ্ডলের

উদ্যত হইল। তুষ্টবতী বাধা দিয়া কহিল,—যাক্ এখন রাগের মোড়ায় কি বল্‌তে কি বলে ফেল্‌বে। কাল সকালেই যাবে।"

ভিখু স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তুইত জানিস্, গেল অঘ্রাণে তোদের রোগের সময় পাঁচ টাকা নেই। আর আগের ভাদ্দরে তুমণ ধানের দরুণ পাঁচ টাকা, এইত দশটাকা, আমি এ দশটাকারই হাত চিঠি করে দিয়ে ছিলাম, একশো টাকা সে ত কিছুতেই নয়।—"

তুষ্টবতী কহিল, "সে ত আমিও জানি গো, তাইতে ভাবনা হচ্চে। মোড়ল কি এতটা অধর্ম্ম কর্‌তে পার্‌বে?"—ভিখুও ভাবিতে লাগিল। এতটা অধর্ম্ম কি সহিবে? নয় কে হয় করা!—কিন্তু ভাবিয়া দেখিল—এই নয়কে হয় করিয়াই, গরীবের বক্ষ রক্ত শুষিয়াই মণ্ডল মহাশয় গ্রামের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন। এই গরীবের পাঁজরা হাড় দিয়াই তাহার রাজবাড়ীর মত বাড়ীখানা যে আকাশ ছাইয়া উঠিয়াছে। বুকের রক্ত আর দীর্ঘশ্বাস লইয়াই যে তাহার কারবার! স্বামীর নিস্তব্ধতা দেখিয়া তুষ্টবতী কহিল, "মোড়ল মশাই হয়ত ভুল করে দশটাকা কর্‌তে একশোটাকা, করে ফেলেচে, এটা আশ্চর্য্য নয়, অনেকেই ত তার খাতক!"—

ভিখু মুখে যদিও কহিল, "তা হতে পারেও বা" কিন্তু মনে মনে ভাবিয়া দেখিল, "ভোলবার ছেলেই বটে, মোড়-লের পো! ভুলিয়া দিন হয়ত একদিন রাত্রি হইতে পারে, কিন্তু ভুলিয়া পূর্ণ মণ্ডল দশটাকা যে একশোটাকা, করে নাই

ইহা নিশ্চিতই।. নিশ্চয় ভিতরে কিছু কারচুপি আছে," স্থির করিল, কার-চুপিটা ধরিয়া ফেলিয়া ভিটেটুকু রাক্ষসের কবল হইতে মুক্ত করিতে হইবে। পাঁচ কাঠা জমি মাত্র যাহার সম্বল তাহার এতটা সাহস ? পূর্ণ মণ্ডল শুনিলে হাসিত তাহার সন্দেহ নাই।

(২)

সে দিন আর ভিখুরামের কাজে যাওয়া হইল না। খুব ভোর থাকিতেই পূর্ণ মণ্ডলের দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল। মণ্ডল মহাশয় তখন খালি গায়ে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তাম্রকুট সেবন করিতে ছিলেন। ভিখুকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন। "কি রে ভিখু খবর কি ? এত ভোরের বেলায় যে!—যেন পূর্ব্ব দিনের ঘটনা কিছুই তিনি জানেন না—ভাবটা এমনি! ভিখু—"রাম রাম" বলিয়া নমস্কার করিয়া কাছটিতে দাঁড়াইয়া কহিল —"আজ্ঞে বাবু আমার নামে যে নালিশ রুজু করেছেন—সেটা"—

পূর্ণচন্দ্র, হুকোটায় জোর একটা টান দিয়া কহিল, "টাকা না দিলেই নালিশ রুজু হবে এ তো সাদা কথা। তাগাদা করতে ত আর কসুর হয় নাই। গোমস্তাটা হায়রাণ হয়ে গেছ্‌ল। আর এই সামান্ত টাকাটা দিতে পারবি না ? তোর জমিদার বাবুরা রয়েছে ভাবনা কি ?—চিরকালকার অনুগত চাকরকে একশোটাকা দিয়ে আর উপকার করবে না ?—বাবুদের হাত ঝাড়লে পর্ব্বত! তাদের এক এক রাত্তির নাচ গানে যে

সে সব কথায় কোন উত্তর না করিয়া ভিখু জোড় হস্তে কহিল, "আমি ত আপনার কাছহ'তে একশো টাকা নিই নাই।"

পূর্ণচন্দ্র, কহিল, "না নিলে কি আদালতে ওমনি মিথ্যে মামলা রুজু হয়। নিশ্চয় নিয়েছিলি। হাতচিঠি ত আর মিথ্যে বলে না।

ভিখু দেখিল পাষাণের সম্মুখে আর তাহার করুণা নিবেদন অনর্থক! যতই কাঁদাকাটা করো পাষাণের দয়া হইবে না। সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া গ্রামের ফকির পণ্ডিতের কাছে উপস্থিত হইল। ফকির পাঠশালায় পণ্ডিতি করিয়া থাইলেও অনেকে তাহার কাছে আপদে বিপদে পরামর্শ লইতে আইসে। ফকিরও নিজের সূক্ষ্মবুদ্ধির বিচার দ্বারা, কাহাকেও পরামর্শ হইতে বঞ্চিত করে না,—ভিখুও সেই আশ্বাসে পণ্ডিত-মহাশয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; আদালতের কাগজখানা দেখাইয়া কহিল, "দেখুন পণ্ডিত মশাই, আমি ত দশ টাকার বেশী ধার নিই নাই। কিন্তু মোড়ল মোশাই কি করে একশো টাকার নালিশ কর্লে?"

ফকির কাগজখানা হাতে লইয়া কহিল,—"হাত চিঠিতে তোর সই আছে ত?"

ভিখু কহিল, "সই কি করে আর থাক্‌বে বলুন। আমার হাতের টিপসই আছে। লিখ্‌তে কি আর জানি?

ফকির খানিক ভাবিয়া কহিল—"হাতচিঠিখানা লিখেছিল কে বল্‌তে পারিস্? মনে আছে?

ভিখু কহিল "আজ্ঞে মনে আছে। সে ত বেশী দিনের কথা নয়, ওঁর গোমস্তা গঙ্গারাম গাঙ্গুলী লিখেছিল।

ফকির কহিল, "তবেই হয়েছে, আর বল্‌তে হবে না। আর একবার এমনি হিরু মুচির নামে নালিশ করেছিল জানি, তাকেও বিশ টাকা দিয়ে দুশো টাকা আদায় করেছিল। কি করে জন্‌বি বল্‌। এক গুষ্টির মার পাঁচ। ভারি বুদ্ধি খেলাচ্চে, ব্যাটা নে—এখন মোকর্দ্দমা কর্‌।"

ভিখু জোড় হস্তে কহিল, "মকর্দ্দমা কি ক'রে ক'রবো পণ্ডিত মশাই, আমি যে কিছু জানি না!"—

ফকির কহিল,জানি না বল্লেই কি রেহাই পাবি,কর্‌তেই হবে।

ভিখু কহিল "কবে দিন বটে পণ্ডিত মশাই?"

ফকির পাঁজি খুলিয়া হিসাব করিয়া কহিল—"আস্‌ছে মঙ্গলবারে; তুই ত আর আমাদিগকে খরচ দিয়ে নিয়ে যেতে পার্‌বি না। তা নইলে দেখ্‌তাম! তা স্থাখ্‌ ইয়ে কর্‌বি! দুটো টাকা দিয়ে একটা ভাল রকম উকীল দিবি তা হলে হয়ে যাবে।"

ভিখু কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল "আমার যে আজ খেতে কাল নাই পণ্ডিতমশাই। মকর্দ্দমার খরচ যোগাতে কোথায় পাবো?

ফকির কহিল, "তাহলেও যোগাতে হবে। নইলে ডিক্রী হয়ে গিয়ে ভিটে টুকুও থাক্‌বে না।"

ভিটে যাইবার নাম শুনিয়া, ভিখুর চক্ষুদুটী অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল—এই তাহার পৈতৃককালের কতদিনের ভিটে, এটুকু যাইলে

সে দাঁড়াইবে কোথা—ফকিরের দিকে একটা করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল। "তাহ'লে মকর্দ্দমা করতেই হবে পণ্ডিতমশাই।"

ফকির উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া কহিল, "হঁা!"—ভিখু কহিল, "হাতে পায়ে ধরে একবার মিটিয়ে নেবার কথা বল্লে হয় না?"—

ফকির কহিল, "হবে না! মিটিয়ে নেবার কথায় আরও চেপে ধর্‌বে।—জানিস্ না তো এই রকম পাঁচজনার হয়ে হুযুরে নিয়েই দেশের মধ্যে মণ্ডল মহাশয় প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৩)

ভিখু পত্নীর কাছে আসিয়া সমস্ত সংবাদটা প্রকাশ করিয়া কহিল, "মকর্দ্দমা কর্‌তেই হবে। নইলে ভিটেটুকু বাঁচাবার কোন উপায় নাই।" কিন্তু এদিকে খরচেরও একান্ত অভাব।" স্বামিস্ত্রীতে মহাভাবনায় পড়িয়া গেল! যে কয়গণ্ডা পয়সা ছিল তাহা দুইদিন বসিয়া খাইতেই ফুরাইয়া গিয়াছে, ধার পাইবারও আর সে সুযোগ কোথাও নাই! গরীবের দিকে কে চায়?—অথচ এই ভিটেটুকু বজায় না করিলেও নয়। এখানে যে তাহার কত দিনের কত সুখ দুঃখের স্মৃতি পুঞ্জীভূত হইয়া আছে! দুই দিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও যখন একটা টাকা কোথাও কর্জ্জ মিলিল না, তখন স্বামি-স্ত্রীতে যুক্তি করিল অসময়ের অবলম্বন জালখানাই বেচা যাক। কোথাও কাজ কর্ম্ম না জুটিলে জাল ঠেঙাইয়া দিন চলিত। ভিটের মায়ায় সে জালখানাও ছাড়িতে হইবে। কিন্তু বিক্রয় করাই এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল! কালা বাগ্দী পাঁচ সিকার বেশী দর

দিল না,—অথচ তাহার ন্যায্য দর আট দশ টাকার কম নয়। ভিখুর সেটা বুনিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল; অবশেষে অনেক কাকুতি মিনতিতে, ও ফকির পণ্ডিতের অনুরোধে গ্রামের হরেন্দ্র সামন্ত তিন টাকায় লইতে রাজী হইল,—কথা থাকিল টাকাটা দিতে পারিলে জালখানা আবার ফিরাইয়া দিবে। গরজে অনেকই সহিতে হয়। দুইটি টাকা নিজে কোমরের খুঁটে বাঁধিয়া ও একটি টাকা স্ত্রীকে খরচের দরুণ দিয়া ভিখু যাত্রা করিল,—রাস্তায় বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিল। "একবার জোর করিয়া ধরিতে পারিলে কাহারও কি দয়া হইবে না? আপনাকে আপনি আশ্বাস দিল, "নিশ্চয় হইবে।" মানুষের কাছে দাঁড়াইলে মানুষে কি করুণা না করিয়া থাকিতে পারিবে? কিন্তু আদালতে আসিয়া তাহার সে স্বপ্নটা ভাঙ্গিয়া গেল—দেখিল এ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগত। কেহ কাহারও দিকে চাওয়া ত দূরের কথা, উপযাচক হইয়া দাঁড়াইলেও বিনা পয়সায় কেহ একটা কথা কহিতেও রাজী নহে। পয়সা পয়সা করিয়া এখানকার মাটী শুদ্ধ যেন হাঁ করিয়া রহিয়াছে। ভিখু ভাবিল তাহার ত এই সামান্য পুঁজি,—কাহারও কাছে দাঁড়াইয়া আপনার দুঃখ নিবেদন করিবে, এমন দয়াল কে আছে? জগতের নির্ম্মমতার দিকে চাহিয়া তাহার বড় কান্না আসিতে লাগিল;—আদালতের আমগাছটির তলায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় শীর্ণকায় মলিন চাপকান পরিহিত এক ব্যক্তি ভিখুর কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল, "কি চাও বাপু তুমি?"

ভিখু ভাবিল লোকটি দয়ায় [illegible]বতার। দয়ার অবতার [illegible] দীন-বেশ পরিয়া দীনের সন্ধানে ঘুরিবে কেন? [illegible] নমস্কার করিয়া, জোড়হস্তে কহিল, "হুজুর, [illegible] গরীব আমি —দায়ে পড়েই এখানে আসতে হয়েছে, [illegible] উকীল মুক্তার দেবার ত সাধ্য নাই। আপনি যদি দয়া করে একটা কিনারা করে দেন, তবেই আমার—বাঁচা হয়।"

চাপকানধারী দাঁড়াইয়া কহিল, "বল্ দেখি শুনি ব্যাপারটা?"

ভিখু তখন এক নিঃশ্বাসে পূর্ণ কর্ত্তৃক তাহার অন্যায় পীড়নের কথা, ভিটেখানি ক্রোক করিবার কথা, নালিসের কথা, বলিয়া গেল। চাপকাধারী হাসিয়া কহিলেন, "এই সামান্য ব্যাপারটা মাত্র, ও তো একটা জবাব দিলেই বাদী বিশ হাত জলে পড়ে যাবে। মকর্দ্দমার খরচ কি এনেছিস্ বল্ দেখি!"

ভিখু চাপকানধারীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল!

চাপকানধারী কহিলেন, "বিশ্বাস হচ্চে না বেটা, আমি যে রামলাল মোক্তার রে, আমাকে দেশের কে না জানে—"

ভিখু লজ্জিত হইয়া কহিল, "হাঁ তা জানি হুজুর"—বলিয়া অতি কষ্টে টাকা দুটী বুকের দুই ফোঁটা রক্তের মত বাহির করিয়া কহিল, "আর নাই হুজুর, পথ খরচা পর্য্যন্ত নাই।"

রামলাল টাকা দুটী মুহূর্ত্তে পকেটে ফেলিয়া কহিল, "মোটে এই দুই টাকা—আর?—আর ফিরে দিনে দুই টাকা দিবি এখন-দেখি কাগজখানা!—কত টাকার মকর্দ্দমা দেখা চাই কি না?—"

ভিখু কাগজখানা মোক্তারের হাতে দিয়া কহিল, "মোটে দশ

টাকার পাওনাদার তিনি, কিন্তু একশো টাকার নালিশ করেছেন”—

রাম লাল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “যা তোর কিছু ভাবনা নাই। আমি সব তোর ঠিক করে দেব।”—

ভিখু বিদায় লইবার সময় বারবার করিয়া কহিল “তাই দেখবেন হুজুর, গরীবের ভিটেখানি মাত্র সম্বল। সে খানি গেলে মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁই থাকবে না।”—

মোক্তার আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “ভয় নেই রে—কিছু ভাবনা নাই। আমি এমন আর্য্যি দোব যে তোকে, ও দশটাকাও দিতে হবে না। হাত চিঠি খানা যে লিখেছিল তাকে সাক্ষী মানতে পারবি ত?”

ভিখু কহিল,—“পারবো হুজুর।” ভিখু আশ্বস্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল, ভাবিল যদিই টাকাটা দিতে হয় তবে দশ টাকার বেশী দিতে হইবে না। এক মাস, দেড় মাস প্রায় দুই মাস কাটিয়া গেল। স্ত্রী তুষ্টবতী কহিল, “কই গো কোন মোক্তারকে টাকা দিয়ে এসেছিলে একটা চিঠি পর্য্যন্ত যে নাই।”

ভিখু স্ত্রীকে কহিল, “জানিস্ না ত; সে ভারি দয়ালু মোক্তার—কত তাঁর কাজ, সর্ব্বদাই চিঠি লেখা, কি ওমনি সাধারণ কথা?—কাজ হাসিল হয়ে গেছে এ আমি খবর নিয়েছি।

তুষ্টও ভাবিল হবেও বা,—এতদিন সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়া গিয়াছে। আসলে কিন্তু কোন ঝঞ্ঝাট চোকার খবর কেহ পায় নাই। ভিখুই মনকে আঁখি ঠারিয়া আপনাকে মিথ্যা মায়ায় ভুলাইয়া রাখিতেছিল। পূর্ণমণ্ডলের কাছ হইতেও সে কোন

খবর সংগ্রহ করিতে পারে নাই। শারদীয়া পূজা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। জমিদার বাবুদের বাড়ীতে ও মণ্ডল মহাশয়দের বাড়ীতে ইতিমধ্যেই ঘটা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, লোক লস্কর ও ঝি চাকরদের কাজের বিরাম নাই। ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুরের চাল বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হইতেছে। গ্রামের ছেলে মেয়েদেরও আনন্দের বিরাম নাই। ভিখু আনন্দময়ীর আগমনে আপনার ভগ্ন কুটীরখানি আনন্দালোকে ভরাইয়া তুলিবার অপেক্ষায় আছে। সেদিন সকাল হইতে লাল মাটী দিয়া ঘরের দেওয়ালটা রাঙাইতেছিল। স্ত্রী তুষ্টবতী, পুত্র, পরাণ, ও ভিখু তিনজনেই ঘরের কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছে, এমন সময় ঠিক তাহার ঘরের পার্শ্বে ডুগ্ ডুগ্ করিয়া ঢোল বাজিয়া উঠিল। ভিখুর হাত হইতে ঘর নিকাইবার নেতাটী পড়িয়া গেল। তাহার মনে হইল যেন সহসা তাহার মাথার উপর দিয়া বিনাশের একটা বাদ্য বাজিয়া গেল। তিনজনেই অমনি বাহিরে আসিয়া শুনিল। এই বাজনা তাহাদেরই ভিটা হইতে উচ্ছেদের বাজনা! পূর্ণ মণ্ডল আর পনের দিনের বেশী এই ভিটাতে থাকিতে দিবে না!—পেয়াদাটা খুব উচু গলাতেই হাঁকিয়া গেল। তুষ্টবতী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া কহিল "ওগো কি হবে গো!—

শিশু পুত্র পরাণও তাহার মায়ের কান্নায় যোগ দিল। বাহিরে চারিদিকে কৌতুহলী দৃষ্টি! ভিখু একবার তাহাদিগকে থামাইবার চেষ্টা করিল!—কিন্তু আপনাকেই থামাইতে পারিল না। তাহার বুক ফাটিয়া হু হু করিয়া উষ্ণ অশ্রুর স্রোত বহিয়া গেল।

তুষ্টবতী কহিল—মোক্তারকে যে টাকা দিয়ে এলে মোক্তার তার কি কর্লে ?"

ভিখু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, "আমি ত টাকা দিয়ে এসেছিলাম আর মোক্তারও আমায় কাজ হাসিল করে দেব বলেছিল !—এমন হবে তা ত জান্তাম না।"

তুষ্টবতী কহিল, "চলো আমিও শুদ্ধ মোক্তারের কাছে একদিন যাই। নিশ্চয় ভুল হয়েছে; দশটাকায় কি একশো টাকা হয় ওমনি।—"অভাগিনীর তখনও ভ্রম ঘুচে নাই। অভাগিনী তখনও ভাবিতেছিল, বুঝি ভুল ! মহাভুল হইয়াছে ! ভুলটা শোধরাইয়া দিলেই ভিটেখানি তাহারা ফিরিয়া পাইবে। নারী জানিত না যে তাহাদেরি বক্ষরক্ত অপহরণ করিয়া পৃথিবীর এত ঐশ্বর্য্য ! অবশেষে মোক্তারের কাছে যাওয়াই স্থির হইল। তিনজনেই একদিন যাত্রা করিল।

সন্ধ্যাবেলায় মোক্তার মহাশয় ইজি চেয়ারটায় পড়িয়া দক্ষিণের একটু হাওয়া খাইতেছিলেন। আলবোলায় সুগন্ধি তামাক পুড়িয়া যাইতেছিল। এমন সময় অন্ধকারের মধ্য হইতে ভিখু ডকিল "মোক্তার মশাই।"

মোক্তার মহাশয় মুখ ফিরাইয়া কহিলেন। "কে—"ভিখু কহিল "আজ্ঞে আমি ভিখু।" মোক্তার মহাশয় কহিলেন। "ভিখু সেখ ?"—ভিখু কহিল "আজ্ঞে আমি ভিখু দুলে। কাঁঠাল-গাছিতে বাড়ী।"

মোক্তার কহিলেন "ওঃ—বুঝেছি। তোর মোকৰ্দ্দমা ত' নষ্ট

হয়ে গেছে। শুনলাম পূর্ণ মণ্ডলের ন্যায্য পাওনা। সেই জন্য জবাব টবাব আর কিছু দিই নাই। টাকাটা যোগাড় ক'রে দিলি না কেন?" ঘোমটার মধ্য হইতে তুষ্টবতী বলিতে যাইতেছিল,—সে খবরটা পেলে ত? অনেক গুলা শক্ত শক্ত কথাই তাহার ঠোঁটের আগায় আসিয়াছিল। ভিখু তাহাকে ইঙ্গিতে ঠাণ্ডা করিয়া মোক্তারকে কহিল। "তা হলে আমার উপায়?"

মোক্তার মহাশয় কহিলেন, "উপায় নিলেম রদের মকর্দ্দমা—

ভিক্ষু কহিল "তাতে কত টাকা লাগবে?"

মোক্তার কহিলেন,—"তা সব শুদ্ধ ত্রিশ চল্লিশ টাকার কমে কিছুতে হবে না।. আবার কতদিন পড়বে। তাই করবি না কি।—"ভিখু খানিক স্তব্ধ থাকিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না মোক্তার মশাই, আর তাতে কাজ নাই এত টাকা কোথায় পাবো?" বলিয়া লম্বা একটা সেলাম ঠুকিয়া কহিল, "তাহলে আসি মোক্তার মশাই, ছেলে পিলে শুদ্ধ সঙ্গে এসেছিল আপনার কাছে দুঃখের কান্না কাঁদতে।" মোক্তার একবার তাহার সন্তান ও পত্নীর দিকে চাহিয়া তারপর মুখটা ফিরাইয়া কহিলেন, "আচ্ছা এসো।" মকর্দ্দমার জবাব দিব বলিয়া দুটা টাকা যে বেমালুম খাইয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার কোন উচ্চ বাচ্য করিলেন না; ভিখুও সে টাকার কোন উল্লেখ না করিয়া স্ত্রী পুত্রের হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার মাথার উপর প্রলয়ের অন্ধকার ঘনীভূত! পদতলে কঙ্করাকীর্ণ বসুন্ধরা! তবু যাত্রী তিনজন রাজপথ বাহিয়াই চলিয়াছে! আবার তাহারা গ্রামেই

ফিরিয়া যাইবে—যেখানে কোথাও একটু সহানুভূতি পায় নাই,—করুণা পায় নাই,—আবার সেই গ্রামেই ফিরিয়া যাইবে! আজন্মের পরিচিত পল্লীবাসের উপরে এত মায়া। পরদিন সন্ধ্যাবেলায় ভিখু যখন গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হইল তখন পূজাবাড়ীতে বাজনা বাজিয়া উঠিল! জমিদার বাড়ীতে নহবৎও বাজিতে লাগিল।

ভিখুকে যে:দিক দিয়া বাড়ী যাইতে হয়, পূর্ণ মণ্ডলের চণ্ডীমণ্ডপ ঠিক তাহার সামনেই পড়ে। সস্ত্রীক ভিখু সেইখানে আসিয়া একবার আটকা পড়িয়া গেল। মহিষমর্দ্দিনীকে একটা প্রণাম না করিয়া যাইতে পারিল না!—ভিখু প্রণাম করিল, তুষ্টবতীও প্রণাম করিল। কিন্তু প্রণাম করিতে করিতে সে তাহার চক্ষের জল রাখিতে পারিল না; কাঁদিয়া কহিল,—"মা দুর্গা তুমি ত এলে ঘরে ঘরে আনন্দ নিয়ে; আমার ভিটেটুকুই শুধু কেড়ে নিলে? কিছু রাখলে না মা?"

ভিখু তুষ্টর হাতটা চাপিয়া কহিল,—কাঁদিস্ না। আবার ঘর হবে। চল ঘরে চল!"

জন সাধারণ তখন পূজার আনন্দে উন্মত্ত। খোদ পূর্ণচন্দ্রও মহামায়ার অষ্টোত্তর শত নাম জপে বিভোর, তন্ত্রধারক "রূপং দেহি ধনং দেহি" বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন।

কখন ভিখু আসিল; গেল, কেহ দেখিতেও পাইল না। দিন কতক পরে গ্রামবাসীরা শুনিল ভিখুরা গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে।

পিয়াসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়াও চারু যখন বিবাহ করিতে রাজী হইল না, তখন চারুর বাপ্ হরকুমার, বৃদ্ধ কন্যাদায়গ্রস্ত শশি-শেখরকে অন্যত্র চেষ্টা দেখিতে বলিলেন। শশিশেখর কাঁদিয়া কহিলেন,—"হরকুমার বাবু—এতদিন আশা দিয়া পরে নিরাশ করলেন, কাজটা কিন্তু ভাল হইল না আপনার।"

হরকুমার কহিলেন,—কি কর্ব্বো বলুন। আজকালকার ছেলে যদি বিবাহ কর্ত্তেই রাজী না হয়—তা হ'লে পীড়ন কর্ব্বার ত উপায় নাই। একটু রূঢ় কইলেই যখন বাঁকিয়া বসে।"

শশিশেখর বুঝিলেন যে এ ছল ভিন্ন আর কিছু নহে—গরীবের মেয়ে টাকা পাবার সুযোগ নাই। আগে কথা দিয়াছিলেন, এখন কি বলিয়া প্রত্যাহার করেন, কাজেই একটা মিথ্যা জবাব ত দিতে হইবে। ক্ষুন্নমনে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন; এমন সময় চারুর বন্ধু ও প্রতিবেশী প্রিয়ভূষণ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, বৃদ্ধের বোঁচকা বাঁধা দেখিয়া কহিল, "কি মিত্তির মহাশয়, চারুর মত হলো না?"

বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, না বাবা ভোগান্তিই সার হলো। আজ কতদিন ধরে ধন্না দিচ্ছি, না মত হলো,—সেই আগে

একবারে খোলসা জবাব দিলেই ত হতো—বলিয়া আবার প্রিয়-ভূষণকে চুপি চুপি কহিলেন—পারো যদি বাবা দেখ দেখি, তোমারা ত চারুর বন্ধু,যদি চারুর মত করিয়ে দিতে পারো। বেচারা গরীব আমি—এ কন্যাদায়গ্রস্তের একটু উপকার কর্লেও পুণ্যি আছে।

প্রিয় কহিল—আপনি শান্ত হোন আমি এর উপায় দেখছি, বলিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধ আবার একটু আশার আলোক পাইয়া বোঁচকাটি নামাইয়া রাখিয়া তামাক টানিতে লাগিল। হায় রে বাঙ্গালী ঘরের মেয়ের বাপ্—কত লাঞ্ছনা সহিতেই কন্যা-দিগকে বক্ষে ধরিয়া লালন করিয়াছ। প্রিয় গিয়া চারুকে কহিল—তা হ'লে তুমি একেবারেই বিবাহ কর্বে না ?

চারু কহিল,—তার কি ব'লতে পারি—তা হ'লে ওখানে যে কর্বোনা একথা নিশ্চয়। গরীবের ঘরের মেয়ে এনে অনেকখানি দৈন্য পোয়াতে হবে—তাতে আর সন্দেহ নাই। আমি ওখানে বিয়ে কর্বোই না।

প্রিয় কহিল—শুনেছ ত মেয়েটি সুন্দরী, তাতে যদি হৃদয়ের মিলন হয়—টাকায় কি করে! প'ড়েছ ত ? Let Rome in Tibermelt, মৈশুরীর প্রেমে এণ্টনী বলেছিলেন।

চারু কহিল,—রেখে দাও ও ইংরেজীর কথা। আমরা ত আর ইংরেজ নই। গৃহবাসী বাঙ্গালী আমরা।—আমাদের বিয়েতে মেয়ের বাপের রীতিমত অর্থ উপঢৌকন যোগান চাই-ই। বলিয়া বর্ত্তমান ইংরাজীশিক্ষিত বাবুদের নব্য চা'লের উপর অনেক টিপ্পনী কাটিয়া দিল।

প্রিয় সে সব কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল, তা হ'লে তুমি এক বস্তা টাকাকেই বিবাহ কর্ব্বে? হৃদয়ের সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নাই?

এ সময় চারুর বাপ এধার দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, কথাটা শুনিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন, বকিস্ কেন বাবা ও গোঁয়ারের সঙ্গে, বেশ হয়েছে, মেয়েটার কপালে দুঃখ নাই, শশিশেখর অন্যত্র কোথাও চেষ্টা দেখুন। তেমন সুন্দরী মেয়ে!—ব্যাটা কোথায় যে রাজকন্যে আর অর্দ্ধ রাজ্য পাবেন, তা ত ব'লতে পারি না, বলিয়া চলিয়া গেলেন।

চারু গম্ভীরভাবে বইএর পাত উল্টাইয়া যাইতে লাগিল,—মনে মনে কহিল, দিন পাই ত এর কথা কইব।

প্রিয়ভূষণ শশিশেখরকে হতাশ সংবাদ দিয়া কহিল, এখন যান। আমি এর যদি কোন উপায় কর্ত্তে পারি, পত্র লিখবো।

শশিশেখর বুঝিলেন, প্রিয় যাহা করিবে তাহা ত আর তাঁহার অবিদিত নাই। কত হাতী, ঘোড়া গেল তল—তা সামান্য একটা বালক আসিয়া তাহার উপকার করিবে? আচ্ছা দেখা যাউক, কতদিনে যে মা কালী কূল দেবেন, তিনিই জানেন—বলিয়া বৃদ্ধ আষাঢ়ের চাষার মত মাথায় ছাতিটি দিয়া বোচকাটা হাতে ঝুলাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রিয়ভূষণ বাড়ীতে গিয়া কহিল,—মা, গরীব কন্যাদায়গ্রস্তকে দেখে আমার ভারী দুঃখ হলো। বেচারা এতদিন ধরে ধন্না দিলে,-তবু হরবাবুর বাড়ীর কারু কি একটু দয়া হলো না।

মা তখন অপরাহ্ণ বেলায় রামায়ণ পড়িতেছিলেন, মনটা ভারি খোলাসা ছিল, হাসিয়া কহিলেন, তুই মেয়ের বাপকে ডেকে বল্লি না কেন? আমাদের বাড়ী এসো আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে কর্ব্বো।

প্রিয় কহিল,—তেমন বলবার ক্ষমতা থাকলে অবশ্য বলতাম। কি করবো তোমার মত না নিয়ে ত আমার বলা ভাল হয় না।

মা পুনরায় পরিহাসচ্ছলে হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা আমি মত দিচ্ছি, তুই তোর হবো শ্বশুরকে পত্র লিখিস্। দশজায়গায় কথা হচ্চে, এক জায়গায় ত হবেই।

প্রিয় কহিল, তা হ'লে একটি পয়সাও পাবে না কিন্তু—বুঝে শুঝে দেখ।

মা কহিলেন, তা না পাই,—না পাবো বা,—টাকা নিয়ে আর কে কদ্দিন ঘর কর্ত্তে এসেছে? বলিয়া আবার পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার একটি মাত্র শিক্ষিত পুত্র, তাহার জন্য কত রাজা, মহারাজা অর্দ্ধ রাজা ও রাজকন্যা লইয়া তাঁহার একটিমাত্র ইঙ্গিতের অপেক্ষায় আছেন। এমন অবস্থায় দরিদ্র শশিশেখরের এখানে আসিবার কি স্পর্দ্ধা আছে? বিবাহের পর ফুলশয্যার তত্ত্বটা দিতে পারিলেও যা হউক কথা থাকিত! কিন্তু একদিন বলির পশুর মত কাঁপিতে কাঁপিতে শশিশেখর মা মহামায়ার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহামায়া প্রিয়কে ডাকাইয়া কহিলেন,—এ কিরে প্রিয়?

প্রিয় কহিল, হাঁ মা,আসতে বলে আজ ফিরুলে চল্‌বে কেন?

মহামায়া কহিলেন তোর ত এ বেহায়-পনা কম নয়! আমি কখন মত দিলাম—তোর মামারা কেউ জান্‌লে না। পাড়া পড়শীর কাউকে ডাক্‌লাম না, একেবারে দিন?

প্রিয় কহিল, এ যখন বিবাহ ভিন্ন আর কিছু নয়, তখন এত হাক ডাকের প্রয়োজনই বা কি মা?

মহামায়া রাগিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, না কক্‌খনই না! আমি ছেলের বিবাহ দেব না! কে আস্‌তে ব'লেছিল ও দায়গ্রস্ত মিন্‌সেকে, উনি এসেছেন এখনি চলে যান্। মায়ের কথার স্বর সপ্তমে চড়িয়া উঠিল।

শশিশেখর তখন বাহিরে আসিয়া দুর্গানাম জপিতেছিলেন। কথা কাটাকাটি শুনিয়া একবার অন্তঃপুর দ্বার পর্য্যন্তও আসিয়াছিলেন, কিন্তু মহামায়ার অগ্নিময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আর ভিতরে প্রবেশ করিবার সাহসে কুলাইয়া উঠিল না। একান্তে সেই দুর্গতিনাশিনীকে ডাকিতে লাগিলেন! তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, কাতর প্রাণে ডাক্‌লে, মা মুখ তুলে চাইবেনই চাইবেন। প্রিয় কহিল, মা এখন রাগারাগি মিথ্যা, তখন মত দিয়েছো—এখন অমত করা কিছুতেই চ'লবে না।

প্রতিবেশিনীরা আসিয়া কহিলেন, তাই যদি মত দিয়ে থাকো বাছ আর তোমার ছেলেরও মত হয়ে থাকে, তবে অমত করোনা। শুভকার্য্যে ও—মন কষাকষি করতে নাই! তাতে যদি এক গরীবকে উদ্ধার করে দাও—

মহামায়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, তা বেশ ছেলের মত হয়ে

থাকে, ছেলে বিয়ে করুক, আমি এর কিছুতে নাই, কিছু কর্ব্বোও না। দেখাশুনো কিছুতে নাই আমি।

প্রতিবেশিনীরা কহিলেন,—তাই কি হয় বাছা; তোমার নিজের ছেলের বিয়ে, তাও একটি! যা সাধ আহ্লাদ কর্ত্তে হয়, সব করো। তোমার ছেলের বিয়ে, তুমি যদি মান করে দাঁড়াও —তবে পাড়ার লোকে এসে দাঁড়ায় কোথা? আর ছেলেই বা বিয়ে করে কোন মুখে?

মহামায়া খানিক স্তব্ধ থাকিয়া সেই পূর্ব্বস্বরেই কহিলেন, তা বলে এই জোড়া মাসেই বিবাহ হবে নাকি? পাঁজী দেখেছে কোন ভট্‌চাজ্জী?

শশিশেখর এইবার কতকটা সাহস পাইয়া, আসিয়া জোড়-হস্তে কহিলেন, বেহান! আপনার যখন মত হয়েছে, তখন বছরের যে মাসেই বল্‌বেন, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। দেখছেন ত গরীব; তাতে আমার অমিয়া—বলিয়া বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। প্রতিবেশিনীরা ব্যথিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন; মহামায়াও ঘোমটা দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। আগামী ফাল্গুন মাসে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। এদিকে যখন প্রিয়ভূষণের বাড়ীতে বিবাহের আয়োজন হইতেছে তখন হঠাৎ একদিন চারুচন্দ্র গ্রামবাসীকে চকিত করিয়া, বাজনার শব্দে দশদিক মুখরিত করিয়া, প্রকাণ্ড আড়ম্বরের সহিত আফিসের বড় বাবুর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া বাড়ী আনিল—লোকে কহিল সাবাস রে চারুচন্দ্র— রাজ্যের সঙ্গে রাজকন্যা, এ কয়টা লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে?

কিন্তু কন্যা দেখিয়া কেহ সন্তোষলাভ করিতে পারিল না। একেতো টেঁসো মারা গড়ন, তার উপর না আছে রং, না আছে মুখশ্রী। চারুর মা কিন্তু বউকে ঘরে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, মেয়ে নিয়ে ত কেই বাইনাচ কর্ত্তে যাবে না? আমার এই ভালো।

চারুচন্দ্র বিজয়গর্ব্বে বারান্দায় পায়চারী করিতে লাগিল—আজ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কে? ধনী শ্বশুরের একমাত্র কন্যা তাহার অঙ্কলক্ষ্মী তাহার উপর—চারিদিককার অজস্র সম্ভ্রম রাশি—পিতা হরকুমারকে শুদ্ধ ঘাড় হেঁট করিতে হইল। প্রিয়ভূষণ আসিয়া কহিল—কি হে দ্বিতীয় মনার্ক নাকি?

চারু গর্ব্বোন্নত বক্ষে কিছু উত্তর না দিয়াই জানাইল কতকটা সেই রকমই বটে। আজ তাহার একান্ত ইচ্ছা, সে সকলকে জানাইতে চায়—সে রূপ রাজ্য জয় না করুক। কিন্তু পার্থিব এমন এক রাজ্য জয় করিয়াছে—যাহার পদতলে পড়িয়া রূপের রাজ্য ভিখারীর মত থাকিতে চাহে। সে কি! সম্ভ্রম গৌরব! না টাকার তোড়া?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই রকমে চারু যখন তাহার মহিমার সমুচ্চ শিখরে সমাসীন। পৃথিবী যখন তাহার পায়ের তলায়—করুণাশায় লুণ্ঠিত। এমন সময় একদিন গোধূলি সময় প্রিয়ভূষণ তাহার নব পরিণীতা পত্নীর

সহিত বিনাড়ম্বরে গৃহে প্রবেশ করিল। আনন্দাবেগে মাতা শুধা-ইলেন, কাকে নিয়ে এলিরে প্রিয় ?

প্রতিবেশিনীরা কহিলেন, প্রিয় তোমার দাসী নিয়ে এলো। টাকার জন্য মহামায়ার যে একটা খাঁকৃতি ছিল, যে একটা গোপন বেদনা—তাঁহাকে কাঁটার মত বিঁধিতে, ছিল বউয়ের মুখখানি দেখিয়া তাহা তাঁহার উড়িয়া গেল। লোকে "আহা আহা" করিয়া কহিল—এমন বউ তাহাদের এ পরশে আসে নাই। যেমন গড়ন তেমনি চোক মুখের ছিরি—কোনো খানটা থুয়ে কোন খানটার নিন্দে করবার যো নেই। কথাটা চারুরও কাণে গেল—কিন্তু তাহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল—এত বড় রূপ যে চারুর এই পার্থিব রাজ্যের বিরুদ্ধেও পাল্টা দিতে পারে ? চেয়ার হইতে কেমন শেলবিদ্ধ ভাবে উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে গেল—মাকে শুধাইল—হাঁ মা প্রিয়র বউ কি খুব সুন্দরী! লোকে ত প্রশংসায় বান ডাকিয়ে যাচ্চে।

মা কহিলেন, না, এমন কি ? তবে খুব খারাপও নয়—খুব ভালও নয় আমাদের বউএর চেয়ে যে বেশী সুন্দরী তাও নয়। —হাঁ তবে রূপের একটু জৌলুস আছে বটে। তা আমাদের বউ এখন রোগা আছে—কালে দুই সমান হয়ে দাঁড়াবে। বলিয়া কহিলেন, এদিকে ত আর কিছু দেয় নাই। দানের আঙটীটা পর্য্যন্ত—ছোটলোকে তেমন দেয় না। চারু এতক্ষণে যেন কতটা সান্ত্বনা পাইয়া বাহিরের ঘরে গিয়া আপনার চেয়ারটাতে বসিল। পা দুটো টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়া কতকটা অর্দ্ধ-

শাস্তি ভাবে (কতকটা গর্ব্বভরে) চাকরকে আদেশ দিল—গাটা ডলিয়া দে ত—রে। অন্য একজনকেও কহিল—তুই আলবোলার নল ধরিয়া থাক। তাহার জানা ছিল—প্রিয় এখনি তাহার বন্ধু বান্ধব লইয়া এখানে আসিবে। বেহারাকে আলোটা আরও একটু উজ্জ্বল ভাবে জ্বালাইতে আদেশ দিয়া মনে মনে ঠিক দিতে লাগিল—"কে বড়" আর কাহার জিত ? দর্শকেরা আসিয়াই বা কাহার জয় ঘোষণা করিবে ?

রূপ ? রূপ ? সামান্য একটু নারীর রূপ লইয়া মানুষের কি বড়াই করিবার আছে ! সেই অনর্থক একটা নিতান্ত কৃপার পাত্রের বিরুদ্ধে এতটা আয়োজন করিয়াছে—তাহার জন্য মনে মনে খুব হাসিল। কিন্তু এই আয়োজনকে সরাইতেও পারিল না। তাহারা অনেকবার ত তাহার এই প্রাধান্য দেখিয়া গিয়াছে। আজও আর একবার না হয় দেখিয়া যাইবে !

এমন সময় সবান্ধব প্রিয়ভূষণ দেখা করিতে আসিল। কহিল "কি ভাই চারু কেমন রয়েছ !" তাহার বিবাহ রাত্রে শরীর অসুস্থ জানাইয়া চারু বরযাত্র যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিল। তাই প্রিয় আগে তাহার স্বাস্থ্যের খবর লইল। চারু কহিল ঐ আছি এক রকম। তারপর একটা চাকরের নিতান্ত অকর্ম্মণ্যতার উল্লেখ করিয়া পাখার বেহারাকে জোরে পাখা চালাইতে আদেশ দিল। ফাল্গুন মাসের সন্ধ্যা—বাহিরের বারান্দায় পাখার ততটা প্রয়োজন নাই কিন্তু আজ চারুর তাহা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। রামধনিয়াকে একটা অন্যায় ধমক দিয়া কহিল "ব্যাটা বাবুদের পান

জল এনে দে !" প্রিয়র সঙ্গীরা ব্যস্ত হইয়া কহিল—থাক্ এত তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নাই। প্রিয় ব্যাপারটা বুঝিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, বাবু যখন তাড়াতাড়িই চাচ্চেন তোমরা তখন সঙ্কুচিত হচ্চো কেন ?

যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা কেহ প্রিয়র সম্বন্ধী, কেহ প্রিয়র শ্বশুর বাড়ীর কুটুম্ব। তাই চারুর পক্ষে তাহার প্রাধান্যটা দেখাইবার এত তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। চারু কহিল দেখনা একপাল আছে। (ভাবটা যেন অসংখ্য) ব্যাটারা সব ভূতের মত ব'সে খেতে পার্বে ! কাজের বেলায় কেউ যদি আছে। তারপর প্রিয়র দিকে তাকাইয়া কহিল—তুমি হাস্‌লে কেন প্রিয় ?

ভাবিল সে বুঝি তাহার হৃদয়ের গোপন স্থানটীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রিয়ভূষণ কহিল—না হাস্‌বো কেন ?

চারু কহিল, ঐ হাস্‌লে—আবার বলো হাস্‌বো কেন ? মিছে কথা না কইলে তোমার দিন যায়না জানি ত ? বলিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল। যে একটা মজলিস্ বসিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহার আর আদৌ সম্ভাবনা দেখা গেল না। প্রিয় তাহার সঙ্গীদের কহিল—চলো বাড়ী যাওয়া যাক।

চারু নিতান্ত ইচ্ছা সত্বেও তাহাদের আর একবার সম্ভাষণ করিতে পারিল না ; কে যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। তাহারা চলিয়া যাইতে আরও গম্ভীর হইয়া বসিল। চাকরেরা ভীত হইয়া বাবুর প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। চারু হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া চাকরদের প্রতি একটা রোষ-কটাক্ষ

করিয়া বাড়ীর মধ্যে গেল! চাকরেরা এই অকাল-জলদোদয়ের কারণ বুঝিতে পারিল না! তাহারা ভাবিল হয়ত বাবুদিগকে তামাক ইচ্ছা করিতে না বলায় বাবু এত চটিয়াছেন। কিন্তু সে চটা ত অন্যায়—প্রভু যখন স্বয়ংই উপস্থিত ছিলেন। চারু বাড়ীর মধ্যে গিয়াও সুস্থির হইতে পারিল না। অকারণে দুধে ধোঁয়ার গন্ধ, মাছে তৈলাভাব উল্লেখ করিয়া খাওয়া অসমাপ্ত রাখিয়াই আসন্ হইতে উঠিয়া পড়িল। বাড়ীর লোক সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। মা ভীত হইয়া বউকে দিয়া পান পাঠাইয়া দিলেন। (অন্যান্য দিন তিনি নিজেই দিতেন) চারু পানের ডিবাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল—কেন আর কেউ কি বাড়ীতে লোক ছিল না ?

চরিমতি কাঁদিতে লাগিল—কহিল আমি ত পান দিতে আস্‌তেই চাইনি—আমায় মা বল্লে কেন ?

চারু গর্জ্জিয়া কহিল যাও—আজ আর এ বাড়ীর মধ্যে থাক্‌বোই না—বলিয়া চটিটা পায়ে দিয়া ফট্ ফট্ করিয়া নীচে নামিয়া গেল। কেহ তাহার অন্যায় রোষের কারণ অবধারণ করিতে পারিল না। চারু নিজেও তাহার কোন্‌খানটায় যে ব্যথা তাহা ঠিক করিতে পারিল না। কিন্তু ব্যথাটা অনুভব করিতে লাগিল! সারারাত একরকম বিনিদ্র অবস্থায় থাকিয়া ভোরের সময় নদীতীর দিয়া বেড়াইতে গেল। সেখানকার শীতল বাতাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াও কহিতে লাগিল—"এ কি কর্‌লাম ? আমার এ কি হ'লো !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইতি মধ্যে চারুর মা জগত্তারিণী একদিন প্রিয়ভূষণ ও তাহার স্ত্রী অমিয়াকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। চারু শুধাইল, দরকার কি মা এর ?

"খেয়ে রেখেছি না শোধ দিলে চ'লবে কেন বাবা, তোমার বিবাহের পর তারা নিমন্ত্রণ করেছিল।"

চারু আর কথা না কহিয়া আপনার ঘরে চলিয়া গেল। এধার ওধার খানিক ঘুস্ ঘাস করিয়া হরিমতিকে কহিল, দেখ, তোমার কোন কাজেরই বিলি, বন্দোবস্ত নাই। এই সব ঘর দোর পরিষ্কার রাখা ত চাই ; তা নয় চারি ধারে কাপড় চোপড় জামা— আজ সব নিমন্ত্রণ খেতে আস্‌বে, লোকে দেখ্‌লে বল্‌বে কি ? বলিয়া নিজেই সম্মুখের আয়নাটা কোঁচার টেপে করিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিল। হরিমতি কহিল, "যার খুসী হবে, সেই কর্ব্বে, কেন, রাজা মহারাণীরা আসবেন নাকি—আমার একাজ নয়" বলিয়া চলিয়া গেল! চারুর মন ভারি তিক্তস্বাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এমনতর একটা ভাল কথাতেও টাকার তোড়া লাফাইয়া উঠে ? প্রতিবিধান করিবার কোন ক্ষমতাই কি চারুর হাতে নাই ? আসন্ন একটা মিলনাশায় আপনার গাঢ় চিত্তক্ষোভ দমন করিয়া ঘরের ধুলা ঝাড়িতে লাগিল, ঘরের কোণে কোথায় একটা মাকড়সার জাল পড়িয়াছিল, সেটাকে শুদ্ধ ভাঙিতে বাদ পড়িল না—একাগ্র-ভাবে ঘরের যেখানে যেমনটি সাজে, তেমনি করিয়া সাজাইতে লাগিল, এরকম কিন্তু সে কখনও করে নাই। হঠাৎ কি রকম

একটা সুকুমার মনোবৃত্তি আসিয়া তাহাকে এই চিত্তরঞ্জন ব্রতে ব্রতী করাইয়া দিল। চারু নিজেই ভাবিয়া ঠিক করিতে—পারিল না—তাহার এ আয়োজন কাহার জন্য? নিজের জন্য ত নহেই। উপরন্তু পরের জন্য বলিতেও বাধো বাধো ঠেকে। কিন্তু তবু তাহাকে একটু খানি বাস, একখানা বিদ্যাপতি বই, দুচারটে ফুলের তোড়া বিছানায় ছড়াইয়া রাখিতে হইল। দেবতা গ্রহণ করুন আর নাই করুন, ভক্তের অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয় নাই। চারু বাহিরে আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রফুল্ল মুখে হরিকে কহিল,—দেখে এসো দেখি, ঘর আমি কেমন সাজিয়েছি।—ঘরে যেও এইবার!

হরি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া দশ জনাকার সমক্ষেই কহিল, যাবোনা তার আর কি? জন্মে যাবোনা, তোমার যাকে বসিয়ে সুখ হয়, তাকেই বসিয়ো। প্রতিবেশিনীরা কহিল, বউ, তোমার ত বাছা মুখ ভাল নয়। চারু হেসে বল্লে এক কথা, আর তুমি দশ কথা শুনিয়ে দিলে? চারু যেই পুরুষ—ভালো, অন্যে হ'লে দেখতে?

চারু আপনার মন্দ অদৃষ্টের উল্লেখ করিয়া কহিল, তোমারাই দেখ। আমি আপনার ফাঁস আপনি গলায় পরেছি। অন্যদিন হইলে চারু এই কথার জন্য যা হোক একটা প্রলয় বাধাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সম্মুখে একটা আনন্দ আয়োজন, ব্যাপারটিকে হাসিতে উড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল। বাড়ীতে ভোজ আয়োজনের তত ঘটা ছিল না। নিমন্ত্রিতের মধ্যে কেবল পড়শীর জনকয়েক, ও অমিয়া আসিয়াছিল—কোনরূপ একটা গোলমাল কি আনন্দ কোলাহল উঠে নাই।

কিন্তু অমিয়া নিমন্ত্রণ বাড়ী প্রবেশ করিতেই এমন একটা আনন্দ দেখা গেল, যাহা এবাড়ীতে অনেক সময়েই দুর্লভ। অমিয়া না খাইয়াই হরিকে চারুর ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। জোর করিয়া তাহার খোঁপাটি খুলিয়া বাঁধিয়া দিতে লাগিল। হরি ইহাতে বার বার আপত্তি করিয়াছিল, অমিয়া তাহা শোনে নাই। মা জগত্তারিণীও দণ্ডেকের তরে অমিয়ার ভক্তি-নম্র আচরণে গলিয়া গেলেন। তাঁহার খাওয়া হইতেই পাত থানা—অমিয়া নিজেই গুটাইয়া লইল। সকলে বাধা দিল, অমিয়া শুনিল না!—যেন এই সেবা শুশ্রূষাই তাহার কার্য্য। মায়ের বুকে—একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া বুকেতেই মিলাইয়া গেল। ভাবিলেন, "এমন বউও হাতে পাইয়া তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

বাড়ী যাইবার আগে অমিয়া আর একবার আসিয়া হরিকে জড়াইয়া ধরিল। শ্যামা সুন্দরীর মত শ্লোক কাটিল, প্রেমের দুই একটা শিক্ষাও দিল তার পর তাহার মুখচুম্বন করিয়া কহিল—ভাই তা হ'লে আসি!

হরি কহিল, এসো!

প্রতিবেশিনীরা হরির এই আচরণে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। অমিয়া ত চিরকাল থাকিতে আইসে নাই। "যাবে কেন দুদণ্ড বসো" একটা মন রাখা কথা বলাও কি তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য? অমিয়া আবার হরিকে চুম্বন করিয়া কহিল, মনে রেখো ভাই যেন দেবতাটিকে পেয়ে পৃথিবীকে ভুলে'যেও না।

হরি কোন উত্তর দিল না। নিজের অশিক্ষিত পটুতার বার বার আপনাকে বিচলিত করিতে লাগিল। তাহার উপরে একটা ঈর্ষ্যাও তাহাকে পীড়া দিতেছিল সে যে সেই নারী, তবে কেন সে এমন স্তব্ধ গম্ভীর—আর কেন অমিয়া এমন প্রফুল্ল কল্লোলময়ী! শক্তি এক কিন্তু প্রকৃতি এত ভিন্ন কেন? —সন্ধ্যার সময় চারু ঘরে প্রবেশ করিয়া হরিকে ডাকাইয়া পাঠাইল।

হরি তখন মা, পিসির কাছে অমিয়ার প্রশংসা, আর তুলনায় তাহার অপটুত্ব (ভাষায় তর্জ্জমা করিলে সেটা নিন্দা ভিন্ন আর কিছু নয়) নির্ব্বিকার ভাবে শুনিয়া যাইতেছিল। একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই। এমন সময় চারুর ডাক্ পড়িল। হরি কহিল, কি কর্ত্তে যাবো এখন।—

পিসিমা কহিলেন, কি নেয় পান টান দেখ না ছাই, যতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো এতক্ষণ যেতে পারতে যে।

হরিমতি রোষভরে সেখান হইতে একবারের গিয়া চারুর ঘরে উপস্থিত হইল, কহিল, এত ডাক কিসের জন্য? একবার যদি বাইরে দাঁড়াবার সময় আছে! বলিয়া এমন সব ভাষায় আপনার অদৃষ্টকে ধিকার দিল, চারু আদৌ তাহাতে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিল না! চারু কহিল, না রুচি হয় চলে যেতে পারো।

হরি বসিয়া কহিল, নাও বলো! আমার—দাঁড়াবার সময় নাই! হরিও জানিত কাহাদের কথার জন্য তাহাকে ডাক্

পড়িয়াছে। চারু অনেকক্ষণ ধরিয়া গুড়গুড়ুটি টানিয়া ভাবটা জমাইয়া কহিল, তারা এসেছিল নিমন্ত্রণ খেতে ?

হরি কহিল, এসেছিল !

চারু। দেখ্‌লে কেমন নারীরত্ন ?—

হরি। দেখলাম, তোমার মত ত ওচিন্তা আর কারু নয়। বলিয়া মুখটি ফিরাইয়া বসিল।

চারু। কথা বার্ত্তার ভঙ্গী ভাব দেখলে ?

হরি। দেখলাম। (কিছু বেশী বিরক্তির স্বর)

চারু। কিছু শিখতে পার্লে ?

হরি উত্তেজিত হইয়া সবলে উঠিয়া কহিল—আঃ—মরণ তার কাছে শিখবো কেন, সে সুন্দরী রূপসী বলে নাকি ?

চারু দেখিল ; তাহার আয়োজন বিফল হয় নাই। বৈকাল হইতে সে এমনি একটা আনন্দ সংবাদ সঙ্গে এমনি একটা অশ্রুর প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছিল। বিদ্যাপতির বইখানার পাতা উল্টা-ইতে উল্টাইতে তাহার মধ্যে দাগ দেওয়া স্থল গুলো পড়িয়া কহিল, বইখানা ত পড়ে নাই ; হরি—জানি না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। চারুর হরিকেও ছাড়িতে ইচ্ছা হইতে-ছিল না। সে যেন আজ একটা গোপন সম্পত্তি পাইয়াছে। তাহার সবটা একা ভোগ করিতে চায় না। অতি গোপনে প্রিয়তমার সহিতও সম্ভোগ করিতে চায়। হরি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল। যেওনা হরি—এতে মন্দ কিছুই নাই। যে ভাল তার প্রশংসা কর্ত্তেই হয়।

হরিমতি রাগিয়া চারুর হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিয়া কহিল। ছেড়ে দাও আমি যেমন মন্দ আছি তেমনি মন্দই থাকি। না পছন্দ হয় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিও। আমি দিন দিন তোমার তাচ্ছিল্য সইতে পার্ব্বো না,—বলিয়া কাঁদিতে বসিল। চারু দেখিল, আর বৃথা আয়োজন, অভিমানিনী নারী যখন তাহার পিতার নাম ধরিয়া কাঁন্দিতে বসিয়াছে, তখন তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া আর কাহারও সাধ্য নহে। কি আক্ষেপই হইতে লাগিল, যে তাহার এমন সৌভাগ্য গর্ব্বিত হৃদয়টা এক অন্তঃসার শূন্য নারীর হাতে পড়িয়া মাটী হইতে বসিয়াছে। বার কয়েক হরিকে থামাইতে চেষ্টা করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। সেখানে প্রিয় একখানা খবরের কাগজ পড়িতেছিল।

চারু কহিল, জ্বলে ম'লাম ভাই—এমন হাড় হাবাতে স্ত্রীও বাছিয়া বাছিয়া গলায় গাঁথিয়াছিলাম। তখন যে বলেছিলে এ টাকার তোড়া বিবাহ—এ তাই হ'লো দেখ্‌ছি।

প্রিয় কহিল—রাত্রিদিন স্ত্রীর কাছ ঘেঁসা হয়ে না থাকলেই ত সব আপদ চুকে যায়,কথাতেইত আছে—কচলালে মিঠেও তিতো।

চারু কহিল, না তোমরাই ভাগ্যবান্ আমি টাকার লোভে মজেছিলাম,—বলিয়া অস্থির ভাবে সেখান হইতে উঠিয়া আবার অন্তঃপুরে হরির কাছে গেল। দেখিল, নারী তখনও কাঁদিতেছে, রোষদাহে বিছানায় ছটফট করিতেছে—আকাশের দিকে চাহিয়া একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল। নিজের দোষে কি ভ্রান্তিই বুকে চাপাইয়াছি। কি রত্নই হারাইয়াছি!—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চারুচন্দ্রের অন্তঃপুর মধ্যে যখন এই রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্লব, বাহিরেও তখন একদিন অগ্ন্যুৎপাত দেখা গেল, চারু শুনিল যে হঠাৎ তাহার শাশুড়ীটি মারা গিয়াছে। হরিমতিও অনেক কাঁদিল মাসেক না যাইতেই শুনিল, তাহার শ্বশুর আবার বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

অনেকে কহিল বিবাহ কার্য্যটাও অমনি গোপনে সমাধা হইয়া গিয়াছে। কথাটা প্রথম চারু আদৌ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কিন্তু যে দিন চারুর শ্বশুর বাড়ীর লোক হরিমতিকে লইতে আসিবার জন্য বলিতে আসিয়াছিল, সেদিন সবটা শুনিয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাহার শ্বশুর এমন উপযুক্ত কন্যা জামাতা ফেলিয়া বৃদ্ধ বয়সে একটি বালিকা বিবাহ করিয়া বসিবে। বাপ হরকুমার কহিলেন ব্যাটাকে এইবার শ্বশুরবাড়ী যেতে বল না, টাকাকড়ি কি কত পায়, নিয়ে আসবে। চারুর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, পিতার এটা ব্যঙ্গ ভিন্ন আর কিছু নয়। প্রতিবেশীরা চারুর শ্বশুরের বিষয় প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। চারু ইহাতে দুঃখিত হইল না। বরং খুসী হইয়া সকলকে জানাইতে লাগিল, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আগে যে বিষয়গর্ব্বের একটা ঔদ্ধত্য ছিল, এখন সেটা একেবারে কমিয়া গেল। এখন সামান্য একটা কুলী মজুরের কাছ হইতে কলিকা লইতে ইতস্তত করে না। চাষার বাড়ীর উঠানে নিজেই মাদুর

পাতিয়া বসিয়া পড়ে। বৈষ্ণব ভিখারী দেখিলে আগে নাসিকা কুঞ্চন করিত, এখন তাহাদের কাছ হইতে গান লিখিয়া লয়। প্রিয়ভূষণের উপরেও গোড়া হইতে একটা দ্বেষ ছিল,—সেটা একেবারেই কমিয়া গেল। এখন চারু প্রিয়র প্রত্যেক কাজে সহায়। বৈরাগ্য এতই জমিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেদিন কি ক্ষণেই বাড়ী প্রবেশ করিয়াছিল—অন্তঃপুরে পদার্পণ করিতেই হরি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—আমায় বাপের বাড়ী পাঠাবে কিনা বল, নইলে আমি আফিঙ খাবো।

চারু মাকে ডাকিয়া কহিল—মা ব্যাপার কি?

মা আসিয়া কহিলেন, হরিকে তার বাপ্‌রা নিতে পাঠিয়েছিল। আমি জবাব দিয়ে দিয়েছি। কার কাছে যাবে ও? বাপ পর, মা পর—কোথায় দাঁড়াবে?

চারু কহিল—ঠিকইত, মা বেশ বলিয়াছ!

হরি গর্জ্জিয়া কহিল—বেশ বৈকি, আজ মা বেটায় মিলে এক হয়েছ?

একটা অপ্রত্যাশিত অপমানে চারুর দিগ্বিদিক ভরিয়া আসিল—মায়ের দিকে চাহিয়া শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, এমন টাকার তোড়াও বিবাহ করেছিলাম আমি?

হরি কহিল—করেছিলে কেন? কে সাধিতে গিয়েছিল? আমার রাজা বাবা ত মশায় মশায় কয়ে আসেন নি? টাকা নিয়েছ তবে বিয়ে করেছ।

চারু আর এখানে থাকা যুক্তিসিদ্ধ নহে—বিবেচনা করিয়া

চলিয়া গেল। জগত্তারিণীও হরিকে চুপ করাইতে খানিক বৃথা চেষ্টা করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। মনে মনে কহিলেন, এমন বড় লোকের মেয়েও বাছাই করে এনেছিল চারু। সারা দিনটা সমস্ত বাড়ী খানাই যেন একটা বিষাদে ভরিয়া রহিল। হরি সারাদিন খাইল না, দাইল না।—সন্ধ্যার দিকে জগত্তারিণী অমিয়াকে ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন, মা দেখ দেখি, তুমি যদি হরির রাগ ভাঙাতে পার; আমাদের কথা ত শুনবে না!—

অমিয়া একেবারে গিয়া হরিমতিকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, ওঠো দিদি—আমার—লক্ষ্মী আমার, স্বামীর কথায় রাগ কর্ত্তে আছে। জানাইত পতি বিনা অবলার কিবা গতি আছে। চারুও এই সময় সেখানে প্রবেশ করিল। কহিল—তুমিই বলো বৌঠান, আমরা মন্দ বলেছিলাম কি?

অমিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া হরিকে টানিয়া তুলিতে লাগিল। 'আঃ লাগছে' বলিয়া হরি একবার তাহার স্বামীর পানে, একবার অমিয়ার পানে চাহিল। তাহার মনে হইল তাহাদের মধ্যে কি যেন একটা ষড়যন্ত্রের বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে—নহিলে এ রকম চাহনির অর্থ কি? সর্ব্বাপেক্ষা, তাহার স্বামীর নির্লজ্জতাটাই বেশী করিয়া চক্ষে ঠেকিল। হঠাৎ নিতান্ত সহজ অবিচলিত স্বরে বলিয়া উঠিল, আমি উঠছি আমায় ছেড়ে দাও।

অমিয়া কহিল তা হলে আমি বাড়ী যাই; তুমি খাবে ত সত্যি করে?

হরি কহিল—খাইব। অমিয়া পুনরপি কহিল, তবে আমি যাই!

হরি কোন কথা না কহিয়া দাসীর সঙ্গে একবারে নীচে নামিয়া গেল। অমিয়াও সেই সঙ্গে নীচে নামিয়া যাইতেছিল কিন্তু, পশ্চাৎ হইতে কাহার আকর্ষণে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। দেখিল, চারু মূঢ় ভক্তের মত অঞ্চলটা ধরিয়া তাহার দিকে একটা করুণাশায় চাহিয়া আছে। অমিয়া অঞ্চলটা ছাড়াইয়া কহিল ছিঃ—চারু উন্মত্তের ন্যায় অমিয়ার হাতটা চাপিয়া কহিল,—যদি এসেছ অমিয়া। তবে একদিন—অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তও আমার এ গৃহ পবিত্র করে দিয়ে যাও! তোমায় ভাববার মত একটা স্মৃতি রেখে যাও। আর—

অমিয়া সবলে হাত ছাড়াইয়া কহিল' ধিক্ এ পুরুষের হৃদয়কে —বলিয়া দ্রুত নীচে চলিয়া গেল। সে গমনেই বা কি একটা ঐশ্বর্য্য—কি একটা গর্ব্ব ছিল।

চারুর বহু আয়াসের স্বর্গ এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেল। মূর্ত্তি-টীর মত জানলার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, ঝি আগে আগে আলো দেখাইয়া যাইতেছে, আর পশ্চাৎ অমিয়া কোমল পাদ-বিক্ষেপে পৃথ্বীতল পবিত্র করিয়া আপনার গৃহাভিমুখে প্রস্থান করি-তেছে। নেশার ঝোঁকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যতক্ষণ না প্রদীপের শেষ রশ্মিটি অন্তর্হিত হয়, ততক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর যখন অমিয়া বাড়ী গিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল—সে শব্দ চারুর কাণে গেল। তখন তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একটা দ্রুত রক্ত-স্রোত বহিয়া গেল। শিরা উপশিরা গুল্ যেন কি একটা বেদনায় ঝিন্ ঝিন্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চারু অসাড় ভাবে হরিমতির পার্শ্বে আসিয়া কহিল, জগৎসংসারটা যে এতদূর

ভ্রান্তি দিয়ে রচনা হরি! তা আমি জানতাম না, এতে যতই অগ্রসর হবে, ততই কি পথ হারাবে? হরিমতি এ হেঁয়ালীর কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। চারু আবল তাবল কত কি বকিল, হরি তাহার একটা কাণেও করিল কি না সন্দেহ?—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাড়ীর আর সকলেই কাজ করিতে ব্যস্ত, কেবল অলস চারুই একখানা বই একখানা খবরের কাগজ লইয়া ভাবে নিমগ্ন হইয়া আছে। ইহার জন্য অনেকের কাছে অনেক সময় তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু তবু সে এই খেয়ালকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। যেন সে কোন সুদূর-স্বপ্ন রাজ্য কল্পনার স্বর্ণ পক্ষ উড়াইয়া দিয়া কিছুর অনুসন্ধান করিতেছে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত ধন খুঁজিয়া পাইতেছে না।

বন্ধুরা একদিন পরিহাস করিয়া কহিল, লোকটা শীঘ্রই কবি হইবে! তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

চারু কহিল ককৃখনই না,—আমি এমন ক্ষুদ্র নহি যে, বই লিখিয়া আপনার প্রতিষ্ঠা করিব!

দেখিয়া শুনিয়া পিতা হরকুমারের চিত্তও চটিয়া উঠিতে লাগিল—তাহার উপর চারুর শ্বশুরের বিষয় প্রাপ্তি সম্বন্ধেও একটা সন্দেহ আছে। একদিন আর তিনি থাকিতে না পারিয়া কহিলেন, এখন আপনার আপনার সব দেখে নেওয়া উচিত। লেখাপড়া শিখেছে চিরকালটা ত আর বাপের আশায় ভর করে চলা ঠিক

নয়। চারুও কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে অস্বীকার করিতে পারিল না। এমন ধারা বসিয়া বসিয়া যৌবনের উদামটা নষ্ট করাও ঠিক নহে। একবার প্রাণপণ করিয়া উঠিতেও চেষ্টা করিল। কিন্তু সে যে কি গোপন বিষে জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছিল—শিরায় উপশিরায় কি যে একটা আশক্তির প্রভাব নেশার মত মিশিয়াছিল সে কিছুতে উঠিতে পারিতেছিল না। অমিয়ার বাতায়ন তলের দিকে চাহিয়া লুব্ধ ভ্রমরের মত কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল!—একটা মিথ্যা আশায় কল্পনার স্বুবর্ণ জগৎ গড়িতেছিল। সংসার স্ত্রী কোথায় পড়িয়া রহিল, তাহার খোঁজই লইল না। সে দিন খুব ঘন ঘোর বর্ষণ করিয়া আসিয়াছিল। ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টির আর বিরাম নাই। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কখন সূর্য্য উঠিল, ডুবিল তাহা কেহ জানিতেও পারিল না—সন্ধ্যার দিকে অন্ধকার একবারে ঘনাইয়া আসিল। জগৎখানি কালি মোড়া হইয়া গেল। চারু এমন বর্ষার সন্ধ্যায় প্রিয়ার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া দূরের বাগান বাড়ীতে বসিয়া "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর" গাহিতেছিল। বৃষ্টি ধারার অবিরল ঝম্‌ঝম্ শব্দে বিদ্যাপতির এ বিরহ-গীতি যেন প্রাণ পাইয়া দিগ্বিদিকে তাহার ব্যথা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। বাতাসের একটা উচ্ছ্বাস পাখীর একটা শব্দ যেন সেই "কান্ত পাহুন কাম দারুণ"—ই প্রকাশ করিতেছিল!—এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল,—বাড়ীর মধ্যে বিপদ, শীঘ্র আসুন।

চারু কহিল, বিপদ কি রকম শুনি?—

চাকর কহিল, বউঠাকুরুণ বুঝি কি খেয়ে ফেলেছেন। আসল সংবাদ দিবার পক্ষে তাহার নিষেধ ছিল। চারু কিন্তু এ রকম সংবাদের প্রত্যাশা আদৌ করে নাই। প্রলয় যেন মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সম্মুখে তাণ্ডব জুড়িয়া দিল।

সেই "তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনীর" মধ্য দিয়াই তাহাকে বাড়ীর দিকে যাইতে হইল। ঘরের মধ্যে যখন প্রবেশ করিল তখন হরিমতির সব শেষ হইয়া গিয়াছে। জগত্তারিণী কাঁদিয়া কহিলেন বাবা, বউকে কিছু বলেছিলে? বউ আমার—আফিঙ খেয়ে ম'লো, এমন সতীলক্ষ্মী মা আমার,—বলিয়া খুব কাঁদিতে লাগিলেন। চারু এক মুহূর্ত্তে একবারে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িল, এতটা যে হইবে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। পৃথিবীটা যেন তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।—যেন কোন সুদূর মৃত্যু রাজ্য স্বনিয়া স্বনিয়া একটা সাড়া আসিতেছে, "তুমি এসো তুমি এসো"। বর্ষা রজনীর কলধ্বনি যে সাড়া ছাপাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।

প্রতিবেশীরা আসিয়া কহিল, আর ভেবে কি হবে? এসো মুখাগ্নি করে সৎকারের যোগাড় করা যাক।

সংবাদ পাইয়া হরিমতির পিতা কালীকান্ত বাবু আসিয়া রুদ্রকণ্ঠে কহিলেন, দাঁড়াও সহজে ছাড়্‌ছি না, আমার মেয়েকে বিষ দিয়ে মারা হ'য়েছে—সঙ্গে সঙ্গে দারোগারও আবির্ভাব দেখা গেল।

হরকুমার গলায় কাপড় দিয়া কহিলেন,—বেহাই যা হয়ে গিয়েছে তা হয়ে গিয়েছে, এখন জামাইটিকে শুদ্ধ খুন জড়াও।

কালীকান্ত কহিলেন, না কক্‌খনই না। পাষণ্ডের শাস্তি দেওয়াই চাই। দারোগা এজেহার লইতে লাগিল। সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া চারু কি বলে শুনিতে লাগিল। চারু অবিচলিত চিত্তে কহিল আমিই আমার স্ত্রীকে আফিঙ আনিয়া দিয়াছি। এবং তাহাকে মরিতে বলিয়াছি। দর্শক সকলে হায় হায় করিয়া কহিল, চারু করিল কি ?

চারু বদ্ধহস্তে কহিল, ঠিক করিলাম, আমার পাপের শাস্তি হওয়াই উচিত। মাতা পিতা আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দন কোলাহলের মধ্য দিয়া চারু হাজতে গিয়া উপস্থিত হইল। আকাশে মেঘ তখনও তেমনি গর্জ্জিতে ছিল, বাতাস তেমনি হু হু করিয়া বহিতে ছিল,—বাহ্য প্রকৃতি যতটা সহানুভূতি দেখাইতে হয়, তাহার ত্রুটি করেন নাই! অন্তর প্রকৃতির মধ্য হইতে, কেবল এক কারাগৃহের কয়েদী, তাহার সাধা গলায় গাহিতেছিল,—

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল!"

বলা বাহুল্য লোকটা গানটার আগাগোড়াই গাহিতে ছিল।

জয়-মাল্য।

প্রতিভা, থিয়েটারের অভিনেত্রী। নূতন নাটকের অভিনয় উপলক্ষে তাহাকে এক পুত্রবতী জননীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাহার ভূমিকা যদিও বেশী ছিল না, তবু সেই সামান্য অংশের ভিতরও এমন একটি রসধারা ছিল, যাহার প্রভাব অতিক্রম করিয়া আসা, তাহার পক্ষে ভবিষ্যতে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কথা পরে বলিব। এখন নাটকের ঘটনাটি মোটামুটি এই যে, এক বেশ্যার মেয়ে তাহার জীবনের সমস্ত আবিলতার মাঝে, একটি শিশুর জননীত্বের ভার লইয়াছিল, এবং প্রাণ দিয়াও সে শিশুকে বক্ষে লইয়া পালন করিয়াছিল, কিন্তু সামাজিক জীবনে তাহাদের স্থান হইল না। পঙ্ক কুণ্ডে জন্মিয়া পঙ্ক-কুণ্ডেই সমাধি লাভ করিল। শেষ দৃশ্যে, শিশুটীকে বক্ষে লইয়া শিশুর পতিতা জননী যখন, সংসারকে ধিক্কার দিতে দিতে অনন্তের পথে যাত্রা করিল, সে সময়কার দৃশ্য দেখিয়া কেহই চক্ষের জল রোধ করিতে পারিল না! সমস্ত দর্শকই একবাক্যে বলিল, চমৎকার!

অভিনয় শেষ করিয়া প্রতিভাও যখন গ্রীনরুমে ফিরিয়া আসিল এবং শিশুর জননীকে তাহার পুত্র ফিরাইয়া দিতে গেল, সে সময় সহসা, তাহারও একি হইল! তাহার নারী-প্রকৃতি যেন এক মুহূর্তে মুখোস খুলিয়া তাহার আসল চেহারাটা দেখাইয়া দিল। প্রতিভা শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু তবু তাহার কিছুই করিবার ছিলনা। সে ত জননী হইবার সুযোগ জীবনে কখন পায় নাই! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার আপনার কৃত্রিম জীবনের পথেই

যাত্রা করিল। তবে পাষাণে আগুন জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছিল! সে অভিনয়-রাত্রির কথা ভুলিল না। একদিন অভিনয় শেষে থিয়েটার হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। শীতের রাত্রি, বাতাস খুব ঠাণ্ডা, মোড়ের দিকে গাড়ী ফিরিতে একটা চাপা ক্রন্দনের শব্দ তাহার কাণের কাছে গেল। গাড়ী থামাইয়া নামিয়া দেখিল, এক অভাগিনী ভিখারিণী বড়লোকের দরজার কাছে কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, ভিখারিণীর মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, কিন্তু তাহার বক্ষের শিশুটি মরা গাছের উপর কিশলয়দলের মত, সবুজ এক প্রাণের রেখায় ঝলমল করিতেছে। মুখে তার এক মুখ হাসি। মা তাহার মরিতেছে; সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপই নাই। সহসা প্রতিভাকে দয়াময়ীরূপে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া ভিখারিণী যেন অকূল সমুদ্রে একটা কূল পাইয়া বাঁচিয়া গেল! এই শিশুটিকে সে মরিবার সময় কাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া যাইবে; তাহা ঠাহর করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় প্রতিভার দর্শন একবারে তাহাকে যেন হাতের কাছে স্বর্গ আনিয়া দিল। প্রতিভার কোলে শিশুটিকে দিয়া সে নিশ্চিন্তে মরিতে পারিল। মৃতাকে সৎকারে পাঠাইতে ও বাড়ী আসিতে তাহার ভোর হইয়া গিয়াছিল। সকাল বেলায় যখন বাড়ীর মধ্যে আসিল, তখন প্রতিবেশীগণ প্রতিভার কোলে নূতন শিশু দেখিয়া একবারে বিস্মিত হইয়া উঠিল। কহিল, "এ ছেলে নিয়ে আবার কি অভিনয় হবে প্রতিভা?"

প্রতিভা কহিল, "সত্য অভিনয়ই হবে। এতদিন মিথ্যার সঙ্গে ঘর-কন্না করেছি, এইবার সত্যের সঙ্গে বোঝা-পড়া করে

দেখ্‌বো।" থিয়েটার পর্য্যন্ত এ খবর গেল। দুই একজন টিট্‌কারী পর্য্যন্ত দিল! কিন্তু তাহার অন্তরের মধ্যে যে মাতৃত্বের অমৃত-উৎস জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেটা সহস্র টিট্‌কারী ও বাধার ঠোকর খাইয়া, আপনার মধ্যে অবিচল হইয়া রহিল। প্রতিভা শিশুটিকে কোলে করিয়া গাহিল—

বেঁধে দিলি সেকি অপরূপ মায়া
এ দুটী মৃণাল ডোরে—
পাব বলে আশ্‌ করিনি যা-ও, তাও
মেটালি মোর। ইত্যাদি

দেখিতে দেখিতে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। লোকে জানিয়াছে, বালক অমূল্য প্রতিভারই পুত্র এবং অমূল্যও জানিয়াছে, প্রতিভাই তাহার জননী। বন্ধু বান্ধব পাঁচজনে কহিল, অমূল্যকে স্কুলে পড়িতে দাও! প্রতিভারও ইচ্ছা তাহাই, ভাল একটি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া ভাল মাষ্টারকে গৃহ-শিক্ষকতায় রাখিয়া তাহার কাছে মনুষ্যত্বের সব দ্বার গুলাই উন্মোচিত করিয়া রাখিবে। এবং তাহাকে অমৃতের অধিকারী করিয়া দিবে। কাছেই "হিন্দু একাডেমি।" দুই একজন স্কুল মাষ্টারের সহিতও প্রতিভার অল্প স্বল্প পরিচয় ছিল। একদিন সোমবারে গিয়া স্কুল গৃহে উপস্থিত হইল। এবং মাষ্টারকে ডাকিয়া পাঠাইল।

প্রতিভাকে দেখিয়াই হেডমাষ্টার মহাশয় মোচে চাড়াদিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি বাইজী সাহেবা, খবর কি?"

প্রতিভার রূপ-খ্যাতির দিনে এই মাষ্টার মহাশয়টিও একবার কলেজের পড়া কামাই করিয়া প্রতিভার সহিত প্রেমালাপ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেইজন্য এতখানি বলিতে সাহস করিলেন। প্রতিভা সে সব কথায় কাণ না দিয়া কহিল, "আমার একটি ছেলে আছে, ছেলেটিকে আপনাদের স্কুলে ভর্ত্তি করে দিতে চাই, কিরূপ মাইনে টাইনে পড়্‌বে, তাই জান্তে এসেছি।"

হেডমাষ্টার কহিলেন, "তোমার ছেলে আস্‌বে তার আর মাইনে টাইনের খবরাখবরের দরকার কি? ছেলে নিয়ে আস্‌বে, ভর্ত্তি করে দেব, তার আর কি?" প্রতিভা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু এই ব্যাপারটা সেকেণ্ড মাষ্টার, থার্ড মাষ্টার হইতে, পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ দিয়া যখন সেক্রেটারীর কর্ণে পৌঁছিল, তখন ব্যাপারটী অন্যরূপে গড়াইল। এবং খুব একটা আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল। বেশ্যার ছেলে স্কুলের ভদ্র সন্তানদের সহিত একত্র পড়িবে? পণ্ডিত মহাশয় বিশেষ করিয়া টিকি আন্দোলন করিয়া কহিলেন, "এ হইতেই পারে না!"

সেকেণ্ডমাষ্টার থার্ড মাষ্টার—তাঁহারাও বলিলেন, "এ হইতেই পারে না!"

যদিও যুক্তিযুক্ত কোন কারণ ছিল না, তবুও সকলের মতে এই কথাটাই সাব্যস্ত হইল, বেশ্যার ছেলের স্কুলে স্থান হইতে পারে না। তখন বাধ্য হইয়া হেডমাষ্টারকে পর্য্যন্ত 'না' বলিতে হইল। আগামী শুক্রবারে প্রতিভার তাহার পুত্রকে লইয়া স্কুলে আসিবার কথা ছিল, হেডমাষ্টার সকাল হইতে

ভাবিতেছিলেন, প্রতিভাকে কি উত্তর দেওয়া যায়, কিন্তু যখন প্রকৃতই প্রতিভা সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন আর সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। মিথ্যার খাতিরই রাখিলেন। প্রতিভাকে স্পষ্টই কহিলেন, বেশ্যা-পুত্রের মানুষের স্কুলে স্থান নাই। বাজের আঘাত—মানুষকে যেমন একেবারে নিস্পন্দ করিয়া তুলে, কথাটা প্রতিভাকে প্রথমটা তেমনি করিয়া স্পন্দহীন করিল, কিন্তু তাহার সহিবারও সে শক্তি ছিল। ফিরিয়া আসিয়া ঘরে বসিয়াছে, প্রতিবেশীরা আত্মীয়তা করিয়া কেহ বা মুখ ফিরাইয়া তাহার এই বাড়াবাড়িতে আপনাদের রুচি অনুযায়ী মন্তব্য প্রয়োগ করিতেছে। এমন সময় থিয়েটার হইতে রসিকলাল প্রতিভাকে রিহার্শেল দিতে ডাকিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রসিক সদানন্দ মুক্ত পুরুষ। জীবনে সে কখনও কোন দুর্ভাবনায় পড়িয়াছে কি না, তাহা তাহার মুখ দেখিলে আদৌ বলা যায় না। একজন প্রতিবেশিনী হাসিয়া কহিল, "চল দিদি, রসিক যে নিতে এলো।" প্রতিভা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অন্য একজন প্রতিবেশিনী সমস্তটা বুঝাইয়া দিয়া কহিল, "প্রতিভা যাবে কি, তার যে মন খারাপ।" রসিক হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল, "এই সামান্য ব্যাপারটাতে তোর মন খারাপ হয় দিদি? অমূল্যকে যখন বুকে তুলে নিতে পেরেছিলি, তাতে যখন এতটুকু বাধে নাই, তখন তার লেখা পড়ার জন্য আবার ভাবনা? সমাজ ত পথ রোধ করে দাঁড়াইবেই, কিন্তু আমরা যে প্রেমের অভিযানে বেরিয়ে পড়েছি,

তা—ত—তারা জানে না। স্কুলের মাষ্টার পণ্ডিতদের কাছে যাওয়াটাই অন্যায় হয়েছিল। ভাবের ঘরে যাদের সদাই চুরি, তারা সত্যকে সত্য ব'লে মেনে নিতে সহসা পারবে কেন? আমি ভরসা দিচ্ছি, আমিই অমূল্যর লেখা পড়ার সব ভার নেবো, ভগবান রামকৃষ্ণের অনুচরদের—মানুষকে মানুষের আসনে, প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্চে কার্য্য!

প্রতিভা উঠিল; কহিল, "সত্যি রসিক, সত্য রক্ষা কর্‌তে পার্ব্বে ত?" রসিক কহিল, "দেখে নেবে, বরাবরই ত দেখে আসছো, যখন প্রথম থিয়েটারে নামি, তখন কতজনা কত টিট্‌কারী দিয়েছিল, কিন্তু মন্দর মধ্য হতেও যে ভালর জন্ম হতে পারে—এ খবরটা—যখন দিলুম, তখন সবাই তাক্ মেরে গেলো। আসলে কি জানো, শ্রদ্ধা করতে পার না পার ভালবাসতে পারাটাই হচ্চে মানুষের কাজ।"

প্রতিভা আপনার কণ্ঠ হইতে সোণার হারটি খুলিয়া রসিকের গলায় পরাইয়া দিয়া কহিল, "রসিক, তুই পুড়াস্ আর নাই পড়াস্, কিন্তু তোর মুখ হ'তে এ কথাটা শুনে ভরসা হয়, যে জগতে দাঁড়িয়ে মানুষ এত বড় কথাটা ব'লতে পারে, সে জগত একবারেই নিরর্থক নয়। মানুষের মত মানুষও নিশ্চয়ই আছে।" রসিক জয়মাল্য পরিয়া থিয়েটার হলে গিয়া উপস্থিত হইল। রিহার্শেল ক্ষেত্রে সেদিন এক নূতন স্রোত বহিয়া গেল।

অক্রূর-সংবাদ।

(বিংশ শতাব্দীর)

১

একটা কথা আছে "যাহারা কুণো লোক" অর্থাৎ যাহারা রে বসিয়া ভাবের চর্চ্চা করে, তাহারা আর যাই হোক, সংসারের হিত যে তাল বাঁচাইয়া চলিতে পারে না, একথাটা ঠিক; । বিষয়ে আমাদের হাল কবি, কুঞ্জলাল তাহার পুরা প্রমাণ দিল।

নেহাইৎ আপনার লোক, কাকা অক্রূর-রমণ আসিয়া যখন হিলেন, যদি নিতান্তই দিতে হয়, তবে দুটো মিথ্যে কথা । হয় বল্‌লি—ক্ষতি কি? আমি ত তোর কাকা বটে, আজ । হয় পৃথক্ হয়েছি।"

কুঞ্জলাল যোড় হাত করিয়া কহিল—মাপ কর্ব্বেন কাকা! মাদালত ধর্ম্ম স্থান, সেখানে দাঁড়িয়ে, হলপ ক'রে যে মিথ্যে কথা তা কিছুতেই ব'লতে পারবো না, যা জানি তাই ব'লবো।

অক্রূরবাবু প্রমাদ গণিলেন। আপনার দীর্ঘটিকি আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, যা জানিস্ তাই ব'ল্‌লেই যে গোল, হাঁরে—তার চেয়ে সাক্ষ্য দেব না—বলাটাই ঠিক নয় কি?

কোন উপায়েই কিন্তু কুঞ্জলালকে সত্য-পথ হইতে হঠানো দুঃসাধ্য হইল। একটু আত্মীয়তার খাতিরও সে রাখিল না। এখন কথাটা হইতেছিল এই, অক্রূর বাবু সম্প্রতি নীলামে একটা পুকুর কিনিয়াছিলেন, পুকুরটা ছিল ছেঁচের অর্থাৎ তার জলে গরীব চাষীরা তরীটা, তরকারীটা ফলটা মাকরটা—করিয়া

খাইত। পাড়াগাঁয়ে এমন অনেক পুকুর থাকে, পুকুরটির স্বামী একজন, কিন্তু তার মাছ রাখা বাদ, বাকিজলের স্বামী গ্রামের কৃষক-সাধারণ। কিন্তু অক্রূর বাবুর ইচ্ছা জোর করিয়া পুকুরটার ছেঁচ বন্ধ করিয়া, তাহার জলে মৎস্যকুলের বৃদ্ধি করিয়া প্রতিদিনকার অন্নগুলি উদরস্থ করিয়া লইবার পক্ষে, নিজের ও বংশাবলীর একটা সুযোগ রাখিয়া যান।

গ্রামের লোক তাহা শুনিবে কেন? ইষ্টি, অনুকূল যাহারা চাষী ছিল, তাহারা বাধা দিয়া মকর্দ্দমা বাধাইল। এবং অক্রূরেরই ভাইপো কুঞ্জলালকে সাক্ষী মানিয়া আদালতে শমনজারীর প্রার্থনা করিল—কাজেই এহেন কুঞ্জলাল যখন বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী—ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার প্রয়াসী, তখন তাহাকে লইয়া কাকাকে অনেকখানি ভাবনায় পড়িতে হইল বৈ কি! কিন্তু কুঞ্জলাল—সে যে কি সত্যের আলোক পাইয়াছিল, কাকা, অক্রূরের অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহাকে "সত্য বই মিথ্যা বলিব না" এটা ভাল করিয়াই জানাইয়া দিল। কাজেই মকর্দ্দমার রায়ের দিন যাহা হইবার তাহা হইয়া গেল। হাকিম কুঞ্জলাল ও আর পাঁচজনের কথাই সত্য মানিয়া গ্রামবাসিদের পক্ষেই ছেঁচ বাহাল রাখিয়া রায় দিলেন। আর রায়টা এমন ভাবে প্রকাশিত হইল—হাইকোর্টে মোশনের সে সুযোগটিও নষ্ট হইয়া গেল। কাজেই অক্রূর বাবুর পক্ষে কুঞ্জলালের দুষমন্ চেহারাটা ছাড়া আর কিছুই রহিল না। কিন্তু কুঞ্জলাল পথে একদিন মিনতি করিয়া কাকাকে কহিল—"দেখুন কাকা, যা সত্য তাই বলেছি, আর গরীব

চাষী, তাদের কথাটাও ত আপনার ভাবা উচিত ছিল! আপনি হ'লেন গাঁয়ের প্রধান ব্যক্তি, আপনি যদি ছেঁচ দেব না ব'লে কোমর বেঁধে দাঁড়ান, তা হ'লে তারাই বা দাঁড়ায় কোথা, আর আমরাই বা আদালতে দাঁড়িয়ে হলপ পড়ে মিথ্যে বলি কোন্ মুখে?

অক্রূর বাবু মুখে একটা পরম নির্ব্বিকারত্বের চিহ্ন আঁকিয়া শিখাটা আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, বেশ ক'রেছো বাবা উপযুক্ত ভাইপোরই কাজ ক'রেছো। আমার কিছু দুঃখ হয় নাই।

কুঞ্জলাল বুঝিল, মুখে তাঁহার এটা নির্ব্বিকারত্বের একটা ভূমিকা মাত্র—ভিতরে যে অনেক খানি সয়তানী মতলব উঠিবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা তাঁহার স্নেহহীন অকরুণ আঁখিটাই ধরাইয়া দেয়। তবু সে দমিল না, কহিল—যা ন্যায়, যা সত্য —তারই পক্ষ সমর্থন করিয়াছি। স্বার্থের দিক চাহিয়া মিথ্যাকে শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিভাষণ করি নাই। আপনার ভাবের রাজ্যেও এ সম্বন্ধে অনেকখানি কবিত্ব ছড়াইয়া গেল, লিখিল—

"প্রহ্লাদ সে সত্য শিশুটিরে ফেল্লে যখন জলে
ডুবলো না সে নাচলো কমল দলে" * ইত্যাদি—

সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বাহির সংসারে যখন কুঞ্জলালের প্রভাব গজাইয়া উঠিয়াছে, এবং নিজেও কবিতা এবং কাব্য লইয়া ভোর হইয়া আছে, তখন একদিন সয়তান সশরীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার চক্ষে দেখা দিল,—কাকার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার

* কিন্তু কবিতার প্রথম দুই লাইন কবি কালিদাস রায় হইতে ধারকরা—

প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। মধ্যপ্রদেশে দাদা মুকুন্দলাল চাকরী করিতেন, সেখান হইতে পত্র আসিল। দাদা লিখিয়াছেন—

"শুনিলাম, তুমি গোপনে গোলা হইতে ধান বেচিতেছ, প্রজাদের খাজনা লুটিতেছ, সংসারের কোন কর্ম্মই দেখ না। যাই হোক, শীঘ্রই ইহার বন্দোবস্ত হইবে।"

কুঞ্জলালের আর বুঝিতে বাকি রহিল না—যে, এ কীর্ত্তি তাহার অক্রূর কাকারই।—কিন্তু কাকার কাছে যাইয়া কি অনুযোগ করিবে? তিনি ত আর কাঁচা খেলোয়াড় নহেন, পাঁচ চাল ভাবিয়া তবে কিস্তী দিয়াছেন! বড় বৌ মানদা সুন্দরীর কাছে আসিয়া কহিল,—(তিনি তখন ছেলেদের লইয়া দেশেই ছিলেন) "আচ্ছা বৌঠান, তুমি কি আমার নামে কখনও কিছু শুনেছ? আমি গোপনে গোলা হইতে ধান বেচি, খাজনার টাকা আদায় করি—নিজের খরচের জন্য?"

মানদাসুন্দরীর কাণ আগে হইতেই ভার হইয়া ছিল—পুষ্করিণীর ঘাটে, অক্রূর কাকার বাড়ীতে যত শুনিতে হয়, শুনিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা অকথ্য, যাহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য, চাষা-বাড়ীর মেয়েদের প্রতি খর-নজর রাখা (যাহাদের জন্যই সে কাকার বিরুদ্ধে লড়িয়াছে), এমন সকল অসম্ভব কথাও মানদা কাকীর নিকট হইতে শুনিয়া রাখিয়াছিলেন। তবে খানিকটা চক্ষু-লজ্জা, খানিকটা মানুষকে চিনিবার যো নাই বলিয়া, ঘৃণায় সবটা প্রকাশ করিয়া বলিয়া ওঠা হয় নাই। কিন্তু আপনা হইতেই কুঞ্জলাল যখন কথাটা পাড়িল, তখন ছাড়িবেন কেন?

মুখটা বাঁকাইয়া কহিলেন,—"লোকে কাণাকাণি ত অনেক দিন হ'তেই ক'চ্চে, ধান ত বেচো, গোমস্তার কাছ হ'তে খাজনার টাকাও নাও জানি, তা সংসার খরচের জন্য কি নিজের খরচের জন্য, তা আমি মেয়ে মানুষ কেমন ক'রে ব'লবো ?" কুঞ্জলালের হৃদয়টা মহাশূন্যের মত সম্পূর্ণ নিস্তাপ ও স্তব্ধ হইয়া আসিল। খানিক সেই ভাবে নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তারপর ধীরে ধীরে কহিল—তারজন্য কি এসব বিষয় নিয়ে দাদাকে কখনও পত্র লেখা হয়েছিল ? মানদা তখন কড়াইয়ে দুধ চাপাইয়া জ্বাল দিতেছিলেন, একটা তীব্র ঝাঁঝের সুরে কহিলেন, কি পত্র লেখা ? পত্র লিখতে কি জন্য যাবো ? আমি কি ঘর ভাঙ্‌তে ব'সেছি নাকি ! তাই বিনিয়ে বিনিয়ে খুঁটিনাটীর খবর লিখে পাঠাবো ? যার সংসার, যার ভাই, সেই এসে সব বুঝ্‌বে।

প্রেম, মৈত্রী, সখ্যের কবিতাগুলা আজ যেন তাহাকে চাবুক মারিতে লাগিল। এই নারীকেই না সে একদিন কল্পনার সুমহান্ লক্ষ্যে রাখিয়া, মায়ের দিক হইতে,—ভগ্নীর দিক হইতে, ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি গাঁথিয়া উপহার দিয়াছিল ? বেচারা কুঞ্জলাল জানিত না যে, সংসারটা তাহারই মত কয়েকটি নিরীহ প্রাণীর দ্বারা চালিত নহে, তাহার মধ্যে কত প্রলুব্ধ সয়তান, সৃষ্টির বিরাট সৌন্দর্য্য খণ্ডগুলির পানে শ্যেন-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। বেদনায় বুকটা বড় মর্ মর্ করিয়া উঠিল ! কিন্তু কোন উপায় নাই, স্বয়ং ঈশ্বরই যখন হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন।

দাদা মুকুন্দলাল বাড়ী আসিয়াই কুঞ্জলালের কাছ হইতে সমস্ত

হিসাব পত্রের তলব করিলেন। তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও যদিচ কিছু গলদ বাহির হইল না, তথাপি মনের খট্‌কা কিছুতে গেল না। কাকা অক্রূর রমণ স্পষ্টই কহিয়াছিলেন যে, তিনি প্রমাণ দিতে পারেন। তবে দুই-ই ভাইপো,—সেটা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছেন মাত্র। ইহার পরে কুঞ্জলালের সম্বন্ধে আর কি প্রমাণ থাকিতে পারে? তাহার উপর রাত্রিকালে স্ত্রীর অনুযোগও নিষ্ফল হইল না! কুঞ্জলালের চরিত্রের কথা, ঘুমের কথা, কাকার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা, অবশেষে একদিন কেমন করিয়া অতি তুচ্ছ কয়েকটা মিষ্টান্নের জন্য পুত্র ভবানন্দকে কাঁদাইয়া সবটাই নিজের স্ত্রীর জন্য রাখিয়াছিল, তাহা শুদ্ধ বলিতে বাদ পড়িল না! মুকুন্দলাল অন্তরে অন্তরে যদিও এই সমস্ত অল্পশিক্ষিত স্ত্রী-সমাজের উপর আদৌ আস্থাবান ছিলেন না, তথাপি উপস্থিত ব্যাপারে স্ত্রীর কথাগুলিকে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া উড়াইতেও পারিলেন না, ভাবিলেন সংসারে অসম্ভবই বা কি আছে! তাঁহার হৃদয়ও গুরুভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে পৃথক্ হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে স্বামী স্ত্রী কাহারও মতভেদ রহিল না। শীঘ্রই শুভ সংবাদ গ্রামের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বড় বউয়ের পক্ষীয়েরা, যেমন ক্ষান্তর মা, নতুন বৌ, মেজো গিন্নী ইত্যাদি আসিয়া অত্যন্ত হৃষ্টতার সহিত কহিল, শুনে বড় সুখী হনু বড়বউ, তোমায় আর গতর জল করে পরের জন্য খেটে মর্‌তে হবে না, কর্ত্তাকেও আর নিজের রোজগারের টাকাগুলির আর একজনাকে সমান অংশ ভাগ দিতে হবে

না। তোমাদের এত রোজগার, ভাবনা কি ?

কাকীমা আসিয়া কহিলেন, বল যে ওদের কাকা বেঁচে থাকুন, একা দিগ্বিজয়ী কাকা হতেই সব দিক জল জলাট হয়ে উঠবে।— বলিয়া একটা কটাক্ষের সহিত, ছোট বউ প্রমোদার ঘরের দিকে তাকাইলেন। মানদা সে চাহনির অর্থ বুঝিতে পারিয়া অন্তরের সহিত কাকীমার কথায় সায় দিয়া গেল। অত্যন্ত বিনয় করিয়া কহিল, তোমরাই বলো বাছা আমাদের কি কোন দোষ আছে ? মানুষে আর কত সইতে পারে ! নইলে বল্‌বে যে, তাঁর ভেয়ের উপর কোন অটান আছে, তাও নয়। ছেলে পিলে হয়েছে, লোকসানও ত আর সওয়া যায় না ! আগে যা করেছ তা করেছ বাপু, বই লিখেছ আর ঘুমিয়েছ, তাতে কেউ কিছু বলেছে ?

সকল কথাই কুঞ্জলালের কর্ণে প্রবেশ করে, শুধু দাহে কিছু বলে না, নীরবে একটা চরম পরিণামের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। প্রমোদা একদিন কাঁদিয়া কহিল, 'দেখ তুমি তোমার দাদার পায়ে ধরে বল যে, পৃথকে কাজ নাই ! তুমি বই টই নিয়ে থাকো, কেমন করে সংসার চালাতে হয় জানো না, —তা পার্ব্বেও না।" কুঞ্জলালের অন্তরেও দিবারাত্র এই কথারই প্রতিধ্বনি ছুটিতেছিল। সে যে সংসারের কিছুই জানে না, সে কথাটা সে নিজে এবং আশপাশের আর পাঁচজন বেশ করিয়াই বুঝাইয়াছিল, কিন্তু হইলে কি হয় ? সে যে পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছে, পুরুষের পৌরুষত্ব ত 'না'র দিকে নয়, তার গতিই যে 'হাঁ'র দিকে ! সে পৌরুষ-হীন হইয়া শুধু কবিত্ব লইয়া থাকিবে, সেই বা কেমন

কথা ? গর্জ্জিয়া স্ত্রীকে কহিল, এতদূর অক্ষম বলে আমায় ভেবো না, ক্ষমা চাইতে হয় তুমি দাদার কাছে, ক্ষমা চাও, আমার আর সে প্রবৃত্তি নাই, দাদা ভাইকে ত্যাগ করতে পারে, আর অক্ষম ভাইই বুঝি কিছু পারে না ? না হয় তাঁর দিন যাবে সুখে, তিনি রোজগার করতে পারেন বলে,—আর আমার দিন যাবে দুঃখে, তা আমি গ্রাহ্যই করি না ; "সুখ আর দুঃখ ভগবানের একই নিয়-মের দুই দিক মাত্র।"

মুকুন্দলালও প্রথমটা মনে করিয়াছিলেন, এই যে পৃথকের প্রস্তাব তুলিতেছি, ইহাতে কুঞ্জলাল নিশ্চয়ই আসিয়া দাদার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া লইবে। অন্ততঃ একবারও আসিয়া বলিবে, "দাদা আমার অপরাধ কি ?" কিন্তু দেখা যাইতে লাগিল, তাহারও এই পৃথক্ হওয়া ব্যাপারে যেন সম্পূর্ণ অভিমত রহিয়াছে, একটা কথার প্রতিবাদ করিতেছে না, অথচ গম্ভীর ভাবে সমস্ত আরোপিত অভিযোগ মাথায় পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছে, ব্যাপার খানা কি ? মানুষকে ত চিনিবার যো নাই। যে কুঞ্জলালকে এত ভাল বলা যাইত, ছেলে বেলা হইতে যাহার দাদার পরে অসীম ভক্তি ছিল, জীবন-মধ্যাহ্নে একটু সুযোগ পাইয়া সেই দাদার সহিত সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছে ? "তত্তারে" বলিয়া মুকুন্দলাল বন্ধু বান্ধবদের এই পৃথক হওয়া ব্যাপারে উপস্থিত হইতে পত্র লিখিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে গ্রামের ভদ্রবর্গ উকীল ও অক্রূরবাবু থাকিয়া সমস্ত সম্পত্তি দুইভাইকে বণ্টন করিয়া দিলেন।

অভিজ্ঞেরা কহিলেন, "চুল চেরা" ভাগ হইয়া গেল।

মুকুন্দলাল কহিলেন, কুঞ্জলাল দেখে নাও! বেশ তন্ন তন্ন করে বুঝে নাও, কোথাও তোমার কিছু আপত্তি আছে কি না?

কুঞ্জলাল অবিচলিত স্বরে কহিল, না দাদা কিছু না, আমার কোন আপত্তি নাই।

অক্রূর হুকা টানিতে টানিতে পরম বিজ্ঞতাভরে কহিলেন, হাঁ বলা ভাল, দেখ কোথাও খুঁৎটুৎ থাকলো কি না। তখন শেষ কালে বলবে যে, আমি ছোট ছিলাম দশজনে আমায় ঠকিয়েছে, সেটা বড় বদনামের কথা।

কুঞ্জলাল অক্রূর রমনের ভিতরে এক, আর বাহিরে আর এক রকমের অভিসন্ধি, বহুদিন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল, তবু সে নীরবে অনেক কথা সহিতেছিল, কিন্তু উপস্থিত একবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল—কাকা, আপনার আর কিছু না বল্লেই ভাল হয়। এযে পৃথক হওয়া গেল, সে ত কেবল আপনা হতেই! আপনিই আর ভাইকে ভাই বলতে দিলেন না। আমি কিছু জানি নাই মনে করেছেন, সব জেনেছি সব বুঝেছি, কেবল বলতে বাধো ঠেকছিল মাত্র, কিন্তু যতই করুন, হৃদয় ভাঙতে পার্ব্বেন না। বলিতে বলিতে তাহার বড় বড় চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল! অক্রূর যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, এই ভাবে একটা পরম বিস্ময়ের ভাণ করিয়া খানিক কুঞ্জলালের মুখের দিকে চাহিয়া তারপর জনান্তিকে কহিলেন, রাধে, এ তোমার ইচ্ছা নইলে যারই ভাল করতে যাই সেই বলে কিনা বদ! তা কথাতেই ত আছে—কলিকালে সব

উল্টো! কুঞ্জলালের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, হাঁ বাবা কুঞ্জলাল, এতদিন পরে এই ধারণাটাই তোমার হলো?

কুঞ্জলাল গম্ভীর স্বরে কহিল, হাঁ কাকা, সেই ধারণাটাই আমার খুব প্রবল! আমি স্পষ্টই যেন আপনার কাছ হতে শুনতে পাচ্ছি, আমায় শাসিয়ে বলছেন—বেটা বড় স্পর্দ্ধায় উঠেছিলে,—আর আজ বড় স্পর্দ্ধায় নামিয়েছি। ঠিক জায়গায় আঘাতটা পড়িয়া অক্রূর একবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। এত লোকের মাঝখানে এমন কথা। যা বলিতে কেহই সাহস করে না, কুঞ্জলাল তাহাই বলিল! একটা দুঃসহ দাহে জ্বলিয়া উঠিয়া অক্রূর উঠিয়া পড়িলেন। পাঁচজনে অনেক করিয়া তাঁহাকে বসাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু জেদাজেদিতে তাঁহার রোক যেন আরও বাড়িয়া গেল। উচ্চ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,থাক বেটা কুঞ্জ, যদি এর কখনো শোধ নিতে পারি—তবেই আমি পুরুষ!

রাগের মহড়ায় হুকাটাকে খুব জোরে টানিতে টানিতে, অঙ্গুলি প্রবিষ্ট চটি জোড়টি পায়ে দিয়া চলিয়া গেলেন। বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞেরা কুঞ্জলালকে বুঝাইল, কহিল, কাকার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাও; নইলে তোমার জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বাদ করার ফল ভোগ করতে হবে। কুঞ্জলালেরও কি রকম রোখ চাপিয়া গিয়াছিল, সে ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীর স্বরে কহিল, উনি যা করতে পারেন তাই করবেন, তা'বলে কাকাই হোন আর যিনিই হোন, দয়তানের পায়ে হাত বুলুতে পার্ব্বো না।

দাদা মুকুন্দলালও খানিক ভাবিয়া কহিলেন,—দেখ কুঞ্জ

কাজটা ভাল করলে না, বুড় মানুষ ও'কে চটানো ঠিক নয়।

কুঞ্জলাল কহিল, না দাদা ঠিক কথাই বলা উচিত, মুখের উপরি জবাব না পেয়েই ত এত বেড়ে গেছে!

৩

পথে আসিতে আসিতে অক্রূর রমণ মতলবটা ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। বাড়ী আসিয়া তাড়াতাড়ি স্নান আহারটা সমাপন করিয়া সেই দিনই তিন মাইলের পথ, রামচন্দ্রপুরের মধু মণ্ডলের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন। অক্রূরের বিপদে তিনিই একমাত্র বিপত্তারণ মধুসূদন! মধু আগ্রহ ভরে সবটা শুনিয়া তারপর বিজ্ঞের মত ঘাড়টা নাড়িয়া কহিলেন, এতো তেমন বেশী কিছু না। আমার একবার ক'লকাতা যেতে পারলেই হলো। তবে কুঞ্জর হাতের লেখাটি চাই। অক্রূর চট করিয়া পকেট হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া কহিলেন, আমাকেও তেমন কাঁচা লোক পাওনি, যখন নাচতে নেমেছি তখন ঘোমটা দেওয়া অভ্যাস নয়, বলিয়া পত্রখানা সযত্নে মধুর হাতে দিয়া কহিলেন, এই নাও, এই কুঞ্জর হাতের লেখা! মধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার পত্রখানার উপরে চোখ বুলাইয়া কহিলেন, এই এম্নিই ঠিক কুঞ্জলালের লেখা?

অক্রূর কহিলেন, হাঁ! তার ঘরের পেছনে ঢের অমন লেখা পাওয়া যায়, বাতাসে উড়তে থাকে, পাঁচালী টাচালী কি লেখে কি না? সে যা হোক ছাই ভস্ম, আমার তাতে কিছু যায় আসে না, আমার কাজটা হলেই হলো।

মধু কহিলেন, অবশ্যই হবে! এ'তো তেমন শক্ত কিছুই নয়। ভাগা-ভাগির কথাটাও সে সময় বাদ পড়িল না।

অক্রুর কহিলেন, বরাবর যা হয়ে থাকে, আধা-আধির বক্রা, জমী জায়গার চৌহদ্দীর ভার আমার রইল! আর বিষয় আসয় ক্রোক না করলেও চ'লবে, অস্থাবরেই টাকাটা আদায় হয়ে যাবে!

মধুও আশ্বাস দিয়া কহিলেন, সমস্ত কাজ পাকা হইলে পত্র লিখিব। বাড়ী আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন প্রহরেক রাত্রি অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। আকাশের চন্দ্র ও নক্ষত্রগুলা রোজ যেমন জ্বলিতে থাকে, তেমনি জ্বলিতেছিল। মানুষের সুখে দুঃখে, বেদনায়, চক্রান্তে কেহই কম্পিত নয়, পৃথিবীও না।—স্ত্রী মহিমময়ী অক্রূরের কাছে জলের গাড়ুটি নামাইয়া দিয়া ভাল মানুষটির সুরে কহিলেন, তা হলে সু-খবর বটে ত?

মহিমময়ী নিজে যদিও সু-খবরের কোন ধারও ধারিতেন না, (কারণ অক্রূরের সমস্ত গুহ্য কথা স্ত্রীর কাছেও অপ্রকাশ রহিয়া যাইত) তথাপি স্বামীর মনটি লওয়াইবার জন্য কহিলেন, সু-খবর বটে ত?

অক্রূর বিজয়ীর উদাত্ত সুরে কহিলেন, আমার আবার কোন কাজে কবে বিফল হতে দেখ্‌লে? অক্রূররমণ যার নাম, যার নামে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়! বলিতে বলিতে গায়ের জামাটি খুলিয়া ফেলিয়া মহিমময়ীর হাতে দিলেন। অতিরিক্ত ঘামে জামাটি একেবারে ভিজিয়া গিয়াছিল, মহিমময়ী সেটি উঠানের তারের উপর ঝুলাইয়া দিয়া কহিলেন, আমার ত বড্ড ভাবনা হচ্ছিল। বলি-

চারিদিকে শত্রু, গিয়েছ কখন একলাটি। ছোড়াটার খুদে বউটার আবার কথা কত? কখন বিকেল বেলায় ঘাটে বুঝি তোমার আর কুঞ্জর কথা উঠেছিল, তাতে কেমন হাত নাড়া দিয়ে বলা হয়েছে আমার স্বামীর ত কোন দোষ ছিল না, কাকাই যত অনর্থের গোড়া! কাকা যেন তার বাপ ভাইয়ের গলায় ছুরি বসিয়েছে. পোড়ার মুখীদের জিব্বে এমনি ?

অক্রূর পাকা গোঁফ জোড়াটি পাকাইতে পাকাইতে কহিলেন, থামতো, তিনটে বৎসর সবুর করতে দাও, তারপর দেখে নেবে কার কদ্দূর ক্ষমতা! "ছেলে ধরতে পারে না, কেউটের গর্ত্তে হাত দেবার সাধ!" আচ্ছা।—

মহিমময়ীও সায়ে সায় দিয়া নিতান্ত পতিগত-প্রাণার মত হুকাটি কলিকাটি কাছে আনিয়া দিয়া কহিলেন, তাকি আমি বুঝি নাই? হ্যাগা? পরশের দশখানা গাঁয়ের লোক তোমার পরামর্শ নেয়, আর দস্যি ভাইপো কিনা হিংসেয় ফেটে মরে! তা যতই হিংসে কর্ আবাগীর ব্যাটারা,তোদের কাকার কাছে হার মানতেই হবে।—

স্বামী স্ত্রী দুজনকার মধ্যেই এমন একটা সংকল্প দাড়াইয়াছে যে, তাহাদের জয়টা অক্ষুন্ন রাখিতেই হইবে, তা সে যেমন করিয়াই হউক। পাপ, চক্রান্ত, অধর্ম্ম, কিছুতেই পেছপাও নয়। লোকে যেন না বলে অক্রূরবাবু ভাইপোর কাছ হইতে মুখের উপর জবাব পাইয়া চুপ করিয়া আছে। জয় চাই! জয় চাই!

৪

অক্রূররমণ কখন যে কুঞ্জর সর্ব্বনাশের বীজ বপন করিয়া

আসিল, কুঞ্জ তাহার কোন খোঁজই লইল না, কেমন করিয়াই বা লইবে? আকাশ বাতাস পর্য্যন্ত যখন স্তব্ধ ছিল। সে যেমন কল্পনার স্বর্ণ পক্ষ মেলিয়া ভাবের রাজ্যে উধাও হইয়া ছুটিয়াছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের পর যে একটা ব্যাথা তাহার প্রাণে জাগ্রত হইয়াছিল, সেটাও এইশূন্য মায়া লইয়া খেলা করিতে করিতে কখন যে কাটিয়া গেল, তাহা সে টের পাইল না। জাগিয়া দেখিল বুকের যেখানটা খালি হইয়া গিয়াছিল, আর পাঁচজন বন্ধু বান্ধবের স্নেহধারা তাহার সে স্থান ভরাইয়া দিতেছে। এতদিন যাহা পায় নাই, তাহাই ঈশ্বরের অপার মহিমার কাছে নত হইয়া গেল। দেখিল—প্রাণের সুরে ডাকিলে কেহ ত ইতস্ততঃ করে না। গ্রামের ইতর সাধারণ হইতে ভদ্র পর্য্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় তাহার বৈঠকখানায় আসিয়া আড্ডা লয়। "কুণো" ভাবটাও আর থাকিল না, দশজনকার মধ্যে পড়িয়া তাহার হৃদয়টাও যেন দশের হইয়া গেল, দেখিল আর শুধু কবিতা দিয়া অনেককে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। জীবনটার আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে, ইহা যেদিন অনুভূত হইল, সেই দিনই সর্ব্বাগ্রে নিজের মজুত ধান্যের অর্দ্ধেক "ধর্ম্ম-গোলা" ভাণ্ডারে জমা দিল। সকলেই কুঞ্জলালের ব্যবহারে খুসী, শুধু অক্রূরেরই হৃদয়ে শান্তি নাই। তাহার উপর সম্প্রতি ধর্ম্ম গোলাটা স্থাপিত হইয়া তাঁহার ব্যবসায়ে ঘোর মন্দা লাগিয়া গিয়াছিল, এটা কিছুতেই সহ্য হইতে ছিল না।

একদিন আত্মীয়তা করিয়া কোন লোকদ্বারা কুঞ্জলালকে বলিয়া পাঠাইলেন, এরকম ছোটলোকদের অত্যধিক "নাই" দেওয়া

ক' বুদ্ধিমানের কার্য্য হচ্চে ? অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে পাতের "কুকুর"
র মাথায় চড়ে বস্‌বে, সেটা ভাবা ত উচিত !

কুঞ্জলালও অত্যন্ত বিনয় করিয়া উত্তর দিল। মানুষের কার্য্যই
াহাই,—মানুষকে মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা ! স্বার্থের
ক চেয়ে হৃদয়টাকে খাটো করা ঠিক নয়। অক্রূরবাবু আবার
কদিন শুনিলেন, কুঞ্জলাল গবর্ণমেণ্টের কাছ হইতে টাকা ধার
রিয়া মাঠের মধ্যে এক বড় পুকুর কাটাইবার প্রস্তাব করিয়াছে,
াহার জলে অন্ততঃ হাজার বিঘা জমীর ধান্য বাঁচিয়া যাইবে।

অক্রূর হতাশ হইয়া কেবলই ঘন ঘন মধু মণ্ডলকে পত্রলিখিতে
াগিলেন। মধুও যথাসময়ে পত্রের উত্তর দিতে লাগিল। এক
কদিন অক্রূরের এমনও ইচ্ছা হয় যেন কুঞ্জলালকে ভস্মলোচন
ন্ত্রে ভস্ম করিয়া দেন। কিন্তু দারুণ কলির বাজারে সে মন্ত্রও
ই, তেমন কামরূপ-ফেরৎ ওস্তাদও চক্ষে ঠেকে না।::ভবিষ্যৎ
ন্তানদের একটা কিছু করিয়া রাখিবার সে প্রায়াসটাতে কুঞ্জ
দ সাধিতেছে ! এমন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদও সে জন্মিয়াছিল !
বশেষে বৎসরের শেষে একদিন কাকী পুকুর ঘাটে হাত নাড়িয়া,
রম পুলকিত ভাবে, নবনির্ম্মিত নেকলেশটিকে যথাসম্ভব লোক-
াচন-বর্ত্তী করিয়া প্রকাশ করিলেন, কুঞ্জর আর বিলম্ব নাই,
ার শেষ হয়ে এসেছে ! মধু মণ্ডলের নামটাও বলিতে বাদ
ড়ল না। কথাটা নানা আকারেই তারপর গ্রামের প্রবীণা
ৗনাদের শ্রী-মুখ হইতে বিবিধ ঘটায় উৎসারিত হইতে লাগিল।

কেহ বলিল, কুঞ্জলাল দশহাজার টাকা মধু মণ্ডলের কাছ হতে

ধার নিয়েছে, কেহ কহিল পনের হাজার ইত্যাদি।—কুঞ্জলালের স্ত্রী প্রমোদার কর্ণেও কথাটা প্রবেশ করিল,—কিন্তু সে ভাল বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

স্বামীর কাছে কথাটার সত্যতা যাচাই করিবে মনে করিল! স্বামী কুঞ্জলাল তখন গ্রামের সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে কি রকম শিক্ষা প্রচলন করিলে ভাল হয়, তাহাই গাঢ় মনোনিবেশের সহিত চিন্তা করিতেছিল! একবার বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের বিবরণীটা পাঠ করিতেছিল, আবার জর্ম্মণীর কিণ্ডার-গার্ডেন প্রণালীটার কথাও ভাবিয়া দেখিতেছিল, এমন সময় স্ত্রী আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল "শোনো।"

কুঞ্জলাল বই হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল "বলো" বলিয়াই বইএর পাত উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।

প্রমোদার বড় রাগ হইল! ভাবিল—এমন মানুষ! চারিদিকে এতবড় একটা বিপদের কথা রাষ্ট্র, ঘাড়ে সংক্রান্তি! তবু একটু চেতনা নাই! কেবল বই আর বই লইয়াই আছে! কিছু না বলিয়া অভিমানভরে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

কুঞ্জলাল হাসিয়া প্রমোদার অঞ্চলটা চাপিয়া কহিল, চটে যাও কেন সুন্দরী—বইগুলি ত তোমার সতীন নয়।

প্রমোদা হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না! ভাবিল, এমন সরল,আপন-ভোলা লোকের সম্বন্ধেও কথা উত্থিত হয়? স্নিগ্ধ পরিষ্কার কণ্ঠে কহিল, এ সব কি শুন্‌ছি! লোকে যে বল্‌ছে, পাঁচহাজার টাকা তুমি—কোথাকার মধু মণ্ডল না কার কাছে ধার

ক'রেছ! কই, আমাকে ত একদিনও বল নাই!

কুঞ্জলাল একবারে আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল—তুমি ক্ষেপ্‌লে নাকি? কি আবল তাবল বক্‌ছো, তার ঠিক নাই। কোথাকার কোন মধুমণ্ডল, কে বল্লে তোমায়?

প্রমোদা কহিল, কেন সবাই ত ব'লছে! ওই তোমার কাকীও বলে গেছে, লোকেও বলছে, তবে তুমি টাকা ধার করেছো এ নিশ্চয়! আমায় ব'লতেও পার নাই—তাই টাকা না দিতে পার্লে সব নিলাম করে নেবে এমন পর্য্যন্ত শুন্‌লাম।

কুঞ্জলাল কহিল, আমার যা কিছু দেনা পাওনা সে ত আর তোমার কাছে অবিদিত নাই। আমি সংসারের কিছু কি দেখি, সে তুমিই জানো; বলিয়া ভাবিতে লাগিল!—ভাবিতে ভাবিতে কহিল, তুমি ত ভুল শুন নাই, আর কেউ কুঞ্জলাল হবে হয় ত!

প্রমোদা কহিল,না আমি বেশ শুনেছি, তোমারি নাম হচ্ছিল।

কুঞ্জলাল কহিল, তোমার কথা শুনে আমার যে মাথা ধরে গেল! দিনে ডাকাতি, এও কি সম্ভব হতে পারে? যতই কথাটাকে সে আমল দিতে চাহিতেছিল না, কথাটা কিন্তু ততই একটা সন্দেহের খুঁত লইয়া তাহাকে পাইয়া বসিতেছিল। অবশেষে সজোরে কথাটার অমূলকত্ব প্রচার করিয়া স্ত্রীকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিল, কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। বন্ধু বিহারীকে খুব গোপনে সবটা খুলিয়া বলিয়া ইহার প্রকৃত মর্ম্ম অনুসন্ধান করিতে বলিল।—বিহারী ফিরিয়া আসিয়া কহিল, পাগল, কিছুই না!—এটা রচা কথা মাত্র। কুঞ্জলাল হাঁপ ছাড়িয়া

কহিল, বাঁচা গেল ! রচা কথা তবুও আমার কত ভাবনা হচ্ছিল !

৫

অনেক দিন পর্য্যন্ত আর কোন সংবাদ না পাইয়া কুঞ্জলাল নিশ্চিন্তে কবিতার পাতই ভরাইয়া যাইতেছিল—প্রেমের কবিতা লেখা শেষ হইয়া গিয়াছে, কবিত্বের লক্ষ্য এখন ভাবের ইন্দ্রজালের দিকে ছিল না ! ভিতর হইতে একটা উদ্দাম প্রেরণা, তাহাকে আর এক জগতের বাণী প্রচার করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। কুঞ্জলাল সে রহস্য জগৎটাকে চিনিয়াছে, কিন্তু তাহার বার্ত্তা প্রকাশ করিতে সে অসমর্থ, তাহার সাধ্যে কুলাইয়া উঠিতেছিল না ! কি লিখিবে না লিখিবে ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় স্ত্রী প্রমোদা হঠাৎ ঝড়ের মত, সেখানে প্রবেশ করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কহিল,—ওগো কি সর্ব্বনাশ হল গো ! দেখ এসে কারা এসেছে, সব নিলেম করবে। কার কাছে টাকা ধার নিয়েছিলে ? বলিয়া হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কুঞ্জলালের এক মুহূর্ত্তে চিন্তার আবেগ কোথায় মিলাইয়া গেল ! তাড়াতাড়ি চটিটা পায়ে দিয়া বাহির হইবামাত্র দেখিল—সত্যই যে তাই। নাজির কনেষ্টবল ও পাইক গোমস্তায় বাড়ী ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। কুঞ্জলালকে দেখিবামাত্র শীর্ণকায় মধু মণ্ডলের প্রৌঢ় গোমস্তাটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নাজিরকে বলিলেন,—ওই কুঞ্জবাবু, ওঁরই এই বাড়ী।

কুঞ্জলাল কাছে আসিয়া কহিল, ব্যাপার কি মশাই। গোমস্তাটা দাঁত খিচাইয়া কাংস্যকণ্ঠে কহিল,—ব্যাপার কি কিছুই

যেন জানেন না ?—উদোর ? টাকা ধার করেছেন মনে নাই ? এই পাঁচটি হাজার টাকা দিচ্চেন ত—দিচ্চেন, নইলে ঢোল বাজিয়ে —বাড়ীর টিকটিকিটি অবধি বাদ দেব না।

কুঞ্জলাল তাহার অসম্ভব রকম চাঞ্চল্য দেখিয়া ঘৃণাভরে নাজিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, বলুন দেখি ব্যাপারটা কি।

নাজির পরোয়ানা খুলিয়া দেখাইল কহিল, আপনার কুলুপ তালা বন্ধ করিলেও নিস্তার নাই। আমার কুলুপ ভেঙ্গে জিনিষ পত্র শীল কর্ব্বার হুকুম আছে!

কুঞ্জলাল পরোয়ানা পড়িয়া দেখিল—কলিকাতার আদালতেই নালিশটা রুজু হইয়াছিল, এবং গোপনেই কখন ডিক্রিজারি হইয়া একেবারে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরোয়ানা আসিয়াছে।

কুঞ্জলাল কহিল, কই মোকর্দ্দমা যে হয়েছিল—কখন্, তার শমন পর্য্যন্ত ত পাই নাই!

নাজির কহিল, শমন এসেছিল, অবশ্যই- ডিক্রিজারীর পরো-য়ানাও বেরিয়েছিল, আপনি গ্রাহ্য করে খোঁজ নেন্‌নি। এখন টাকাটা দিয়ে দিন।

কুঞ্জলাল কহিল,—আমিই না হয় গ্রাহ্য ক'ল্লাম না। গ্রামের আর কেউ জানে ?

গোমস্তা কহিল,—জানে না ? অক্রূরবাবুকে জিজ্ঞেসা করে আসুন দেখি।

কুঞ্জলাল বুঝিল—সয়তানের চক্রান্তেই এতটা হইয়াছে। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

গোমস্তাটা তীব্রস্বরে কহিল—কি বলছো মশাই, টাকা দেবে—না ঢোল বাজাতে বলবো ? নাজিরের দিকে চাহিয়া কহিল, নেন মশাই, উনি আর কোন উত্তর দেবেন না। আপনি আপনার কাজ করুন। এই ঢুলে ! বাজানা ঢোল,—লোকজন সব আসুক।

নাজির ভাল মানুষটির মত তাহার মুসলমান সুলভ-দীর্ঘ দাড়ীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, মশাই কেলেঙ্কারীটাই ভাল ? আপনারা মান্য গণ্য ব্যক্তি, এই সামান্য টাকাটা ফেলে দিন, উনি যখন নিশেনদারী করছেন, তখন আমাকে বাধ্য হয়েই সা শীল করতে হবে।

সকাল বেলায় কুঞ্জলালের হৃদয়ে যে শুভ্র সুন্দরের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেটা অনেকক্ষণ হইল অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। এখন শুধু এই ভীষণ মুহূর্ত্তে সৃষ্টির বিরাট ভণ্ডামিটার পানে চাহিয়া কেবল শিহরিয়া উঠিতেছিল। সংসার যে এতবড় সয়তানের লীলা-ভূমি হইতে পারে, তাহা সে মোটেই কল্পনাও করে নাই। উপস্থিত ব্যাপারে সে যে কি করিবে কি না করিবে, কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। এতদুর মিথ্যাকে সে কি করিয়া সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে ? পায়ের নীচে হইতে পৃথিবী যেন দ্রুততর বেগে সরিয়া যাইতে লাগিল !

কুঞ্জলাল দুইবার পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল। নাজির আবার জিজ্ঞাসা করিল—কি মশাই, তাহলে আপনি কিছু উত্তর দেবেন না ? কেলেঙ্কারীটাই আপনার ইচ্ছা ?

কুঞ্জলালের যেমন মুখে আসিল—তেমনি কহিল—টাকা

ধার করি নাই যখন, তখন টাকা দেব কোথেকে? তাহার মস্তক বিঘুর্ণিত হইতেছিল। নাজির হাসিয়া কহিল, মশাই পাগল আপনি, টাকা ধার করেছেন না করেছেন, আদালত ত আর মিথ্যে ডিক্রি দেয় নাই! শুনলাম আপনি শিক্ষিত ব্যক্তি, এসবের কিছুই বুঝেন না কি? ডিক্রি হয়েছে, এখন টাকাটা ত মিটিয়ে দেন, তারপর যা করতে হয় করবেন। আদালত ত খোলা রয়েছে।

এমন সময় বিহারী ও গ্রামের কয়েকজন সেখানে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র গোমস্তাপুঙ্গব তাড়াতাড়ি একবারে ঘাড় দোলাইয়া বলিয়া উঠিল, দেখে যান মশায়, আপনারাও ত ভদ্রলোক, এমন ছেলে মানুষী কোথাও দেখেছেন? বলেন— আমি ত কিছু জানি না! বাবা, যাব না বল্লে কি যমে ছাড়ে? কলকাতায় বসে টাকা গুণে নেওয়া হয়েছিল, আজ মনে নাই! কালের গতিকই যে তাই, নেবার সময় নেব বেশ হাত পেতে, আর উপুড় হাত করতে হলেই যত গোল। ঢুলির দিকে চাহিয়া কহিল, নে ব্যাটা বাজা ঢোল! নাজিরকেও কহিল আপনি আর বিলম্ব কচ্চেন কেন? শীল করুন, বুঝছেন ত উনি টাকা দেবেন না।

নাজির মহাশয় তখন 'আমার দোষ নাই' বলিয়া ঢোল বাজাইতে আদেশ দিলেন। এবং নিজের পকেট হইতে পরোয়ানা খানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

ঢোল বাজিতে লাগিল, আর সেটা বিনাশের একটা উন্মাদ

গর্জ্জনের মত গমকে গমকে, এক আকাশ হইতে আর এক আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া ছুটিতে লাগিল। কুঞ্জলাল যুক্তি ও বিচার লইয়া যে একটা আপাতঃ আপোষ নিষ্পত্তির কল্পনাকে মনের মধ্যে অবলম্বন করিয়াছিল, এ রুদ্র নিনাদে আর তাহার তাল রাখিতে পারিল না। হৃদয়ে যাহা কিছু শান্ত সংযত ভাব ছিল, তাহাও নিবিড়তর হইয়া এই প্রলয়ের সম্মুখীন হইবার জন্য তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। বিহারী এ বিবাদে অক্রূরের কাছে পরামর্শ লইবার জন্য তাহার হাত ধরিল। কুঞ্জলাল বিহারীর হাত ছিনাইয়া গুম হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। ঢোলের শব্দে সে আর আপনাকে সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না, তাহার ভিতরটা যেন মরিয়া হইয়া বলিতেছিল, মরিতে হয় অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াই মরিব। একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল, বাড়ীতে লোকে ভরিয়া গিয়াছে, গ্রামের প্রায় সকলেই আসিয়াছে। কেহ মজা দেখিতে আসিয়াছে, কেহ বা একটু সহানুভূতি দেখাইতেও আসিয়াছে। সকলেই আছে, নাই কেবল কাকা অক্রূর-রমণ। কিন্তু কল্পনায় আজ তাঁহার আনন্দোজ্জ্বল মূর্ত্তিখানি বেশ কল্পনা করিয়া লইতে পারা যায়। কাকীরও আজ কত আনন্দ! অন্তরঙ্গ প্রতিবেশিগণও তাহাদের সে আনন্দে যোগ দিয়াছে। আজ তাহাদের শত্রু জালে পড়িয়াছে। কুঞ্জলালের চক্ষে এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর আলো নিবিয়া গিয়া প্রেত-লোকের ছায়ান্ধকার জাগিয়া উঠিল, কাণের কাছে শুনিতে লাগিল, যেন তাহার

ঘরের পাশ দিয়া প্রেতগুলা উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। এমন সময় প্রমোদা-কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ তাহাকে একেবারে পাগলের মত করিয়া তুলিল। নাজির ঘরের দ্রব্য শীল করিবার জন্য প্রবেশ করিতেছিল, প্রমোদা দোরবন্ধ করিতে গিয়া তাহাতে অক্ষম হইয়া কাঁদিয়া লুটাইতেছিল। কুঞ্জলাল পাগলের মত, নির্ব্বোধের মত তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, এ অন্যায়, এ অবিচার! তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

বিহারীও অনেক বাধা দিয়া কুঞ্জলালকে আটকাইতে পারিল না। তখন একটা কোলাহলের মধ্য দিয়া সশস্ত্র পুলীশ ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া সব কোলাহলের অবসান করিয়া দিল। দিবা নিলাম হইতে লাগিল। কুঞ্জলালই শুধু নাজিরের উপর বল প্রয়োগের অপরাধে বাঁধা পড়িয়া থানার হাজত গৃহে গিয়া আশ্রয় লইল।

*   *   *   *

সন্ধ্যা বেলায় অন্ধকার ঘরে যখন ভূমিশয্যা হইতে জাগিয়া উঠিল, তখন প্রথমটা ভাল করিয়া মনে করিতে পারিল না সে কোথায়! এমন সময় পাশের ঘরের কয়েদীদের শিকল-ঝন্‌ঝন্‌নায় প্রকৃত স্থানটা হৃদয়ঙ্গম হইল। মাথা ঘুরিয়া গেল, বুঝিল আজ সে জগতের দোষীর দলেই দাঁড়াইয়া!—

সংসার আর প্রমোদার কথা চিন্তা করিতেও পারিল না। সে করুণ আর্ত্তনাদের মধ্যে ডুব দিতে তাহার মনটাও ভয়ে পিছাইয়া পড়িতেছিল। কুঞ্জলাল ক্ষুদ্র গবাক্ষপথের কাছে খানিক

স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরের শীতল বাতাস আসিয়া তীরের মত তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। কুঞ্জলাল তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না, ঝুকিয়া পড়িয়া কি যেন দেখিতে চাহিল। কিন্তু অন্ধকার, সীমাহীন অন্ধকার—তাহার দৃষ্টি রোধ করিয়া দাঁড়াইল! একটা নক্ষত্রের দীপ্তি পর্য্যন্ত তাহার চক্ষে ঠেকিল না। সারাদিন ধরিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার পরও সে মেঘ কাটে নাই, অন্ধকারটা যেন জমাট বাঁধিয়া ধরণী ও শূন্য এক করিয়া দিতেছিল, আর তাহারি মধ্য হইতে বিদ্যুতের এক একটা পাংশুল দীপ্তি আসন্ন-মৃত্যু জীবনের চপল হাসিটির মত ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কুঞ্জলালের হৃদয়ের মধ্য হইতে আর একটি হৃদয় যেন বাহির হইয়া বাহিরে অনন্ত প্রসারিত অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর সীমাহীন লোকহীন পথ ধরিয়া অনন্ত অন্ধকারের মধ্য দিয়া কেবলই যুগান্ত ধরিয়াই যেন সে চলিতেছে। কোথায় তার ঠিকানা নাই, কি উদ্দেশ্যে তাও তার জানা নাই, তবু চলিতেছে। এক জায়গায় না এক জায়গায় বুঝি তাহার "বুকের বাঝাটি" নামাইয়া রাখিতে পারিবে ;—এই ভরসায়!

সহসা সশব্দে গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল!—স্বপ্ন ভঙ্গে চাহিয়া দেখিল—হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোকে, ছায়ার মত দুটি প্রেত-মূর্ত্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই অল্প কালের মধ্যেই যেন সে মানুষের স্বরূপ ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিল, ঘরের মধ্যে আসিল [illegible]রী।

কুঞ্জলাল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

অক্রূর কহিলেন,—বউমার কান্না সইতে না পেরে এলাম কুঞ্জ! সারাদিন তিনি খান নাই। কেবলি: কাঁদছেন।—উঠে এসো। দারোগাবাবুর কাছে জামিনে খালাস চেয়েছি।

কুঞ্জলাল বিহারীর মুখের দিকে চাহিল। বিহারী কহিল,বিস্মিত হবার কারণ নাই ভাই, এ সত্যই, এখন উঠে এসো।

অক্রূর কহিলেন,—জিনিষ পত্র যা নিলেম টিলেম হয়েছিল, —সে সব আমি ডেকে রেখেছি। টাকা দিলেই ফিরে পাবে।

কুঞ্জলাল আর কিছুই বলিল না, উঠিয়া বাহিরে আসিল। সে যে মনে করিয়াছিল—সরাসরি ঈশ্বরের আদালতে দাঁড়াইয়া তাহার আর্জ্জি পেশ করিবে। অক্রূর তাহারও শেষ করিয়া আসিয়াছেন,—এখন শুধু টাকাটা দিলেই সব মিটিয়া যাইবে।—"হায়রে টাকা" তাহার বক্ষঃ-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহিরের হাহাকারের সঙ্গে মিশিয়া জগতজোড়া অনন্ত হাহাকারের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল।